কিশোরদের প্রতি

বড় মানুষ ও বিপ্লবী যোদ্ধাদের জীবনসংগ্রামের শিক্ষায় বড় হওয়ার সাধনায় ব্রতী হও

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

বড় মানুষ ও বিপ্লবী যোদ্ধাদের জীবনসংগ্রামের শিক্ষায়
বড় হওয়ার সাধনায় ব্রতী হও — প্রভাস ঘোষ

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুলাই, ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, ২০১২
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, ২০১৩
পঞ্চম মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, ২০১৫

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (সি)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ **আট টাকা**

প্রকাশকের কথা

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর কিশোর সংগঠন কমসোমলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা শিবিরে (জুন ২০০৮, মেছেদা) দলের তৎকালীন রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ কমসোমল কর্মীদের উদ্দেশে একটি মূল্যবান ভাষণ দেন। ভাষণটি 'কমসোমল' পত্রিকায় চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং তা দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিভিন্ন জেলা এবং কয়েকটি রাজ্য থেকে ব্যাপক চাহিদা থাকায় কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার পরে ভাষণটি ২০১১ সালের ৭ নভেম্বর পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় পর পুস্তিকাটির দ্বিতীয় মুদ্রণের পূর্বে কমরেড প্রভাস ঘোষ কিছুটা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে দিয়েছেন। বর্তমানে পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

আশা করি কমসোমল কর্মী সহ সর্বস্তরের কিশোর-কিশোরীদের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অক্টোবর, ২০১৫
৪৮, লেনিন সরণী,
কলকাতা ৭০০০১৩

মানিক মুখার্জী

কিশোরদের প্রতি

বড় মানুষ ও বিপ্লবী যোদ্ধাদের জীবন সংগ্রামের শিক্ষায় বড় হওয়ার সাধনায় ব্রতী হও

তোমরা যারা এখানে এসেছ তাদের বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, দাদা-দিদি বা পাড়ার এই ধরনের বয়স্ক কেউ না কেউ পার্টির সাথে যুক্ত, কেউ হয়ত দীর্ঘদিন ধরে, আবার কেউ হয়ত অল্প দিনের পার্টির কর্মী বা সমর্থক। এ ধরনের কর্মী বা সমর্থক অথবা পরিচিত পরিবার থেকেই তোমরা এখানে এসেছ। একথা তোমরা নিশ্চয়ই জান এবং তোমরা লক্ষ করেছ, তোমাদের পরিচিত বা বাড়ির বড়রা দীর্ঘদিন ধরে বহু কষ্ট স্বীকার করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের নানা দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকেন। অনেকে চাকরিও করেন না; অনেক কষ্টে তাঁদের সংসার চলে। যাঁরা করেনও তাঁরাও বেশিরভাগ সময় দলের জন্য কাজ করেন, আয়ের থেকে দলের ফান্ডে অর্থদান করেন, কেউ কেউ প্রায় সম্পূর্ণ আয়ই দেন। তাঁরা কীসের আকর্ষণে এই দলের কাজ করেন, কেন করেন? এমনকী পুলিশের মার খান, জেলেও যান? বেশ কিছু নেতা ও কর্মী তো ইতিমধ্যে পুলিশের গুলিতে ও সরকারি দলের ক্রিমিনালদের আক্রমণে প্রাণও হারিয়েছেন। তোমরা জান, এভাবে নানা কষ্ট স্বীকার করেও এঁরা দলের কাজ করছেন নিছক এম এল এ হওয়ার জন্য নয়, মন্ত্রী হওয়ার জন্যও নয়, নাম যশ বা কিছু বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যও নয়। অন্যান্য দল যারা করে, তারা করে ভোটের রাজনীতির জন্য, সেটা সিপিএমই হোক বা কংগ্রেস, বি জে পি, তৃণমূল বা অন্য কোনও দলের রাজনীতিই হোক। তাদের দলের নেতা-কর্মীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি) দলের এই নেতা-কর্মীদের একটা

বিরাট পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যটা কী? তারা করে ভোটের রাজনীতি, আর আমরা করি বিপ্লবী রাজনীতি। তোমরা জান, এদেশে সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ একটা বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি)-কে গড়ে তুলেছেন। কীসের প্রয়োজনে তিনি এই বিপ্লবী দল গড়ে তুলেছেন? তোমরা জান, আমাদের দেশে গ্রামে শহরে একদিকে অল্প হলেও বিরাট ধনী লোক আছে যাদের ধন-দৌলতের শেষ নেই, আর অন্যদিকে আছে অসংখ্য গরিব লোক। আমাদের দেশ শোষক-শোষিতে বিভক্ত হয়ে আছে। এই সমাজে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি গরিব মানুষ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাচ্ছে, মারাও যাচ্ছে — এসব তোমরা নিজেরাই জান। প্রাইমারি স্কুল থেকে তোমাদের যারা বন্ধু ছিল, একত্রে পড়াশুনা করেছ বা ছোটবেলায় পাড়ায় তোমাদের যারা খেলার সাথী ছিল, তারা অনেকেই আর পড়াশুনা করতে পারেনি। যে সময়টা তোমাদের সাথে পড়বার সময়, খেলাধূলা করবার সময় — সেই সময় তারা রেস্টুরেন্টে বয়ের কাজ করে, বিড়ি বাঁধে, বা খনি এলাকায় কয়লা তোলে, কেউ কেউ কয়লা তোলার সময় মাটি চাপা পড়ে মারাও যায়। মাঠে নানা রকমের কাজ করে, কালী পূজার আগে বাজি তৈরি করতে গিয়ে বাজি ফেটেও এইরকম বাচ্চারা মারা যায়। এরা অনেকেই তোমাদের থেকে ছোট; তোমাদের ছোট ভাইবোনের মতো। এই যেমন তোমরা মেচেদা স্টেশনে নেমে বা হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশন বা যে কোনও স্টেশনে বা শহরে পথের ধারে দেখতে পাও শিশুরা ভিক্ষা চায়, কথাও বলতে পারে না ভালো করে — এদের অনেকের মা-বাবাও নেই। ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনও খাবার জোটে, কখনও জোটে না। এদের যখন জ্বর হয়, অসুখ করে, এদের কোনও মা নেই যে কোলে মাথা নিয়ে সেবা করবে, বাবা নেই যে ওষুধ আনবে। কোথাও মায়েরা ভিক্ষা করে এনে ফুটপাতে রান্না করে ইঁট সাজিয়ে। এই শিশুদের ফুটপাতেই জন্ম, ফুটপাতেই থাকা, ফুটপাতেই মৃত্যু। গোটা ভারতবর্ষে এরকম প্রচুর শিশু আছে, কোথাও এদের বিক্রিও করে দিচ্ছে। সাত আটটি ভাই বোন — কারোরই খাবার জোটে না। চোখের জল মুছতে মুছতে বাবা মা দু-এক জনকে বিক্রি করে দেয় ৪০০-৫০০ টাকায়। একদল ব্যবসায়ী এদের নিয়ে যায়, বিদেশে চালান করে দেয়। সেখানে এদের কারোর চোখ তুলে নেয়, ভিখারি বানায়। কারোর কিডনি বার করে নেয়, বিক্রি করে। প্রায়ই কাগজে এসব দেখা যায়। এই যে আমাদের দেশের দুরবস্থা, এই যে সংকট, এত অভাব অনটন, এ কি এইভাবেই চলবে? এভাবেই দিনের পর দিন বাড়বে? আবার তোমরা যে সব পরিবার থেকে এসেছ — অনেক সময় দেখবে তোমাদের বাবা-মায়ের চোখে মুখে কত কষ্ট। কারণ তোমাদের ঠিক মতো খাওয়াতে

পারছেন না, যত্ন করতে পারছেন না। অনেক সময় বাবা মায়েদের মধ্যে এই নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়, ঘরে অশান্তি হয়, তাতে তোমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। এই অশান্তির মধ্যে তোমরা অনেক সময় ভালো করে পড়াশুনাও করতে পার না। পড়ার ইচ্ছা থাকলেও টাকার অভাবে তোমাদের কত বন্ধু, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ভালো রেজাল্ট ও করত, তারা স্কুল লাইফে পড়া ছেড়ে দেয়, অনেকে ভালো প্রস্তুতি নিয়েও হঠাৎ বাবা ছাঁটাই হওয়ায় বা অন্য আর্থিক সংকটে পরীক্ষার ফি না দিতে পেরে শেষপর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারে না। এসব বন্ধুদের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট হয়! আবার এও দেখা যায় বাবা-মা অনেক সময় অভাবে ছেলেমেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে নিজেরা আত্মহত্যা করছেন। দেখা যায় মা নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছেন সন্তানকে কোলে নিয়ে। কারণ সন্তানকে বাঁচাবার তাঁর কোনও সহায় সম্বল নেই। তোমরা যখন ভালো জামাকাপড় পরে রাস্তায় যাও, উৎসবে-ভোজ খাও, তোমাদের বড়লোক বন্ধুরা দেশ-বিদেশে ঘোরে, তখন তোমাদের বয়সি, তার থেকেও ছোট এই দীন-দুঃখীরা শতছিন্ন অপরিধেয় বস্ত্র পরে ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খোঁজে, নাহয় রাস্তায় কাগজের টুকরো কুড়ায়। এর বেশি আর কিছু যেন প্রত্যাশা এদের নেই। এই হচ্ছে আমাদের দেশের প্রকৃত চেহারা! আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই সুখে-শান্তিতে নেই — ঘরে নেই, বাইরে নেই, পরিবেশের মধ্যে কোথাও নেই। যথার্থ আনন্দ এবং শান্তি বলতে যা বোঝায় তা নেই। গোটা দেশের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্না, একটা গভীর ব্যথার ভার। কেউ বলতে পারে না, ভবিষ্যতে কী তার পরিণতি হবে! ভালো রোজগারে আপাতত সচ্ছল পরিবারও ছাঁটাইয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আশা, স্বপ্ন, কল্পনা যার যাই থাকুক সেগুলো বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। একদল তো পড়াশুনার সুযোগই পাচ্ছে না। যারাও পড়ছে — তারাও ভাবছে, আমার ভবিষ্যৎ কী হবে? যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে, আমি পাশ-টাশ করে চাকরি-বাকরি করব, বাবা-মাকে দেখব, পরিবারের সকলকে দেখব, আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকব, এটাই যাদের স্বপ্ন, তারাও দেখছে তাদের পাড়ায় বা আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরা বয়সে বড়, কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পাশ করেছেন, ভালো রেজাল্ট করেছেন, তাঁদের অনেকেই বেকার হয়ে ঘুরছেন, তাঁদের কাজ নেই। এরকম লক্ষ লক্ষ বেকার দেশে ঘুরছে, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে পিয়নের চাকরির জন্য ঘুরছে, তাও জুটছে না। গোটা দেশে এই যে সমস্ত দিক থেকে সংকট, তা কেন হল? এই সংকটের সমাধান কোথায়? দেশের মানুষকে, গরিব মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা থেকে কীভাবে বাঁচানো যায়?

এরই উত্তর দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষের ধনী-গরিবে, মালিক-শ্রমিকে বিভক্ত শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই

এই সংকটের জন্য দায়ী। সমাধানের রাস্তাও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র এই সংকট থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে পারে। আর এজন্যই তিনি এই বিপ্লবী দল গড়ে তুলেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আজ জীবিত নেই। আমার ডাইনে-বাঁয়ে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের মধ্যে দু'চারজন, তোমাদের বয়সে তাঁকে দেখেছেন। আমি আমার স্কুল লাইফ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি। আমার সময়ে বা আর কিছুদিন পরে যেসব নেতা ও কর্মীরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁরাও দেখেছেন। তাঁর শিক্ষায়, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আমরা লালিত-পালিত হয়েছি। আজ যতটুকু আমাদের গুণে-কথায়-ব্যবহারে ভালো দেখ, সেটা তাঁরই শিক্ষার ফল। এখনকার আমাদের দলের যাঁরা নেতা এবং কর্মী, তাঁরা অনেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে দেখেননি। আজকের দিনে কমরেড শিবদাস ঘোষই আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর একটা পুস্তক পড়লে বা রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরের ভাষণ শুনলেই আমাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, বিবেক জাগে। জনগণের মধ্যেও প্রবল আকর্ষণ তৈরি হয়। কীসের জোরে কমরেড শিবদাস ঘোষ এতবড় শক্তি নিয়ে আমাদের বুকে বেঁচে আছেন? কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম তো কখনও খবরের কাগজ বা রেডিওতে পাওয়া যায়নি। প্রচলিত অর্থে যারা নামী মানুষ, যারা নেতা — প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, এম এল এ, এম পি এসব কোনও পোস্ট তো তাঁর ছিল না। অথচ তাঁর শিক্ষায় এ রাজ্যে ও এদেশে আমাদের দলের কয়েক হাজার কর্মী জীবন দিতে প্রস্তুত। ইতিপূর্বে প্রাণ দিয়েছেনও অনেকে। এ রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যেও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় বহু মানুষ, বহু ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষক, মহিলা, অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী আকৃষ্ট হয়েছেন। ভারতবর্ষের বাইরেও বিপ্লবী যোদ্ধারা আকৃষ্ট হচ্ছেন — এর কারণটা কী? কী ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন, কী ধরনের সংগ্রামের জোরে তিনি এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন? এগুলো তোমাদের জানা দরকার।

সকলেই বড় হতে চায়, কিন্তু যথার্থ বড় হওয়া বলতে কাকে বোঝায়? একরকম বড় হওয়া তোমরা সকলেই বোঝ। শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য — প্রাকৃতিক নিয়মে বড় হওয়া। আর অনেক সম্পত্তির মালিক, বহু গাড়ি-বাড়ির মালিক, অনেক ঐশ্বর্যের মালিক — প্রচলিত অর্থে এই ধনীদেরও বলা হয় বড়লোক। আবার যথার্থ অর্থে বড় কাদের বলে? যাঁদের নাম মানুষ যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে। শত শত বছর ধরে, হাজার হাজার বছর ধরে কিছু মানুষ বেঁচে থাকেন, ইতিহাসে যাঁদের নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এঁরা কিন্তু কত সম্পত্তির মালিক, কত গাড়ি-বাড়ির মালিক, কত

ধন-দৌলতের অধিকারী — সে হিসাবে বড় নন। এঁরা বড় হয়েছেন চরিত্রে-মনুষ্যত্বে। ছোটবেলায় তোমরা পাঠ্যপুস্তকে বুদ্ধদেব, মহাবীর, যিশু খ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ — এঁদের সম্পর্কে কিছু পড়েছ। এঁরা কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। তোমরা পড়েছ রুশো-ভলটেয়ার, তোমরা পড়েছ কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনো, নিউটন এইসব নাম। তোমরা পড়েছ আমাদের দেশের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপত, তিলক, সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী এবং শহীদ ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর, আসফাকউল্লা, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা প্রমুখদের কথা। আবার শুনেছ বিশ্বের সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুংদের কথা। এঁদের কিন্তু কারোরই ইতিহাসে পরিচয় এজন্য নয় যে তাঁরা কে কতটা ঐশ্বর্যের মালিক, ধন-দৌলতের মালিক। তাহলে তাঁরা বড় মানুষ হলেন কিসের জোরে? মনুষ্যত্বের গুণে, চারিত্রিক গুণে। ফলে ছোটবেলায় যে বলা হয় তোমরা বড় হও, মানুষ হিসাবে বড় হও — সে কথাটার যথার্থ মানে কিন্তু এটাই। সংসারে দু'ধরনের মানুষ আছে। একদল ছোটে কত আরামে থাকব, কত ঐশ্বর্য ভোগ করব, কত ধন-দৌলতের মালিক হব — এই লোভে, এই লালসায়। আগে আমি নিজেরটা দেখব, যেভাবেই হোক নিজেরটা গুছিয়ে নিতে হবে, এটাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান — এই এক ধরনের মানুষ। এদের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', বা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। আগে নিজেরটা দেখ, নিজেরটা গুছিয়ে নাও — একদল বয়স্ক মানুষ এই কথাগুলি শেখান। এখান থেকে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হই, স্বার্থপর হই। আর এক ধরনের শিক্ষা হল, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এটা শেখানো হতো, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' — অন্যদের দেখ, অন্যদের কথা ভাব। গরিব মানুষের কথা ভাব। নিজে কষ্ট স্বীকার করেও অপরকে সুখী করার কথা ভাব। অপরকে আনন্দ দিয়েই তোমার আনন্দ। এমনকী কখনও নিজে ঠকলেও কাউকে ঠকাবে না। এই দুই ধরনের শিক্ষার মধ্যে কোনটা আমরা গ্রহণ করব? আমি যে বড় মানুষদের কথা বললাম, তাঁরা ছোটবেলা থেকেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকেও, ব্যক্তিগত আরাম আয়েসের থেকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন পাড়া-প্রতিবেশী, অন্য গরিব-দুঃখীদের প্রতি। যাকে চলতি কথায় বলে দশের কথা ভাবা, দশের জন্য করা। তার জন্য যত কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা করব। এই মন থেকে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। এই মন নিয়েই তাঁরা নিজেদের গড়ে তুলে যথার্থ বড় হয়েছিলেন। ফলে আমরা পরিবেশ থেকে কোন শিক্ষা নেব? দুই ধরনের শিক্ষা আছে, একটা হচ্ছে লোভী হওয়া, স্বার্থপর

হওয়া, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া, অপরকে বঞ্চিত করে, অপরকে ঠকিয়ে, অপরকে পথে বসিয়ে, অপরকে কাঁদিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা; আমার নাম যশ, আমার সম্পত্তি, আমার আরাম আয়েস, আমার স্ফূর্তি এই নিয়ে মত্ত থাকা। স্ফূর্তি বলতে প্রচলিত অর্থে কত দামী ঝলমলে জামাকাপড় পরব, কী ধরনের ঝকঝকে প্রাসাদতুল্য বাড়িতে থাকব, কী ধরনের রঙচঙে গাড়িতে চড়ব, কত রকমের লোভনীয় খাদ্য সংগ্রহ করব, ব্যাঙ্কে কত বিরাট অঙ্কের টাকা জমাব — এ এক ধরনের আনন্দ। আর একটা আনন্দ — ক্ষুদিরামের আনন্দ, ভগৎ সিং-এর আনন্দ, প্রীতিলতার আনন্দ, সকল যুগের বড় মানুষদের আনন্দ। সেই আনন্দের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষও কৈশোরে এইসব বড় মানুষদেরই আদর্শ গণ্য করে যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং এইভাবে সংগ্রাম করতে করতে তিনিও একদিন বড় মানুষ হয়েছিলেন।

তোমাদের কেউ কেউ উপদেশ দেয়, এই অল্পবয়সে এইসব দেশের কাজে, রাজনীতিতে জড়ানো ঠিক নয়, আগে পাশ-টাশ কর, নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর যা ভালো বোঝ, করবে। এটা ঠিক নয়। এই যে ধর, যে ক্ষুদিরামের নাম আমরা উচ্চারণ করি, ১১ই আগস্টে তোমরাও তাঁকে স্মরণ কর, এই ক্ষুদিরাম প্রচলিত অর্থে কিন্তু স্কুলে বেশিদিন পড়েননি, কলেজে যাওয়া তো দূরের কথা। ক্ষুদিরাম কোনও ভাষণও দেননি, এইসব মাইক-টাইকও দেখেননি। ক্ষুদিরাম তেমন কিছু লেখেনওনি, ক্ষুদিরামের যুগে ইলেকশনে দাঁড়ানোর প্রশ্নও ওঠেনি। কিন্তু ক্ষুদিরাম ইতিহাসে একটা নাম। একটা সময় গোটা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে এই নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, কত কিশোরের ঘুম ভাঙিয়েছিল। তোমরা জান কিনা জানি না, নেতাজি সুভাষচন্দ্রেরও সূচনা হয়েছিল এই ক্ষুদিরাম থেকেই। নেতাজি যখন স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র, একটু চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছেন, সে সময়েই তিনি কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের হস্টেলে অরন্ধন করে এদেশে প্রথম ১১ই আগস্ট পালন করেছিলেন। তখন সেই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন বেণীমাধব দাস। তিনিও একজন বড় মানুষ ছিলেন। তাঁর শিক্ষাও ছাত্র সুভাষের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কাজ করেছে। এই বেণীমাধব দাসের কন্যা ছিলেন বীণা দাস। তিনিও একজন বিপ্লবী ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে গভর্নরকে গুলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। সুভাষ বোস যে এতবড় চরিত্র অর্জন করেছিলেন, সেখানে ক্ষুদিরামেরও একটা বড় অবদান আছে। শরৎচন্দ্র যখন মজফ্‌ফরপুরে যেতেন, সেখানে যে ঘাটে ক্ষুদিরামের শবদাহ হয়েছিল সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন, চোখ দিয়ে জল ঝরতো তাঁর। তোমরা একবার ভাব, সে সময়ের মেদিনীপুর জেলার একটা

অখ্যাত গ্রামের ততোধিক অখ্যাত এক তরুণ মাত্র ১৮ বছর বয়সে কীভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের বুকে জায়গা করে নিয়েছেন! এখানে তোমরা যারা আছ, তোমাদের অনেকেরই সে বয়স পেরিয়ে গেছে। সে সময় মেদিনীপুরে বেশ কিছু বড় বড় জমিদার ছিল, জোতদার ছিল, ব্যবসায়ী ছিল, ধনী ছিল, তাদের পরিবারের সন্তানরাও ছিল, বেশকিছু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী ছিল, কিছু কোটিপতিও ছিল, তাদের নাম কে উচ্চারণ করে — কে স্মরণ করে? এই ক্ষুদিরামকে আজও আমরা স্মরণ করি। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা যখন অ আ ক খ-ও শিখিনি, আমার মনে পড়ে, আমাদের অতি স্বল্প শিক্ষিত গ্রাম্য মায়েরা রান্না করতে করতে, থালাবাসন মাজতে মাজতেও ক্ষুদিরামের গানটা গাইতেন। দেখতাম তাঁদের চোখে জল। জিজ্ঞেস করতাম ক্ষুদিরাম কে? ক্ষুদিরাম সম্পর্কে মা বলতেন — যতটুকু তাঁরা জানতেন, বলতেন। সেই যুগে আমার মতো অনেকেরই বুকে গ্রাম্য নিরক্ষর মায়েরা ক্ষুদিরামের নামকে এভাবে এঁকে দিয়েছিলেন। আমার পূর্ববর্তী যাঁরা ছিলেন, আমাদের যিনি শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ সকলেই এই নামটিকে বুকে নিয়েই বিপ্লবী জীবনের সূচনা করেছিলেন। একই চরিত্র ভগৎ সিংয়েরও। ইতিহাসে পাওয়া যায় ভগৎ সিংও ১১ই আগস্ট উদ্‌যাপন করেছিলেন। ভগৎ সিংও ১৩-১৪ বছর বয়সেই রাজনীতি শুরু করেছিলেন। ২৩ বছর বয়সে ভগৎ সিং ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। দু'জনেই সেই যুগে হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়ে সারা দেশের যুবকদের ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এসব তোমরা বড়দের মুখে বক্তৃতায় শুনেছ। বক্তৃতায় একটা বাক্যে বলাটা, আবৃত্তিতে ও গানে বলাটা সহজ। কিন্তু হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেওয়া কি এত সহজ? ক্ষুদিরামও তো তোমাদের মতো কিশোর ছিলেন। ছোটবেলায় যেমন সবারই থাকে — পড়াশুনা করব, পাশ-টাশ করব — ভগৎ সিং-এরও এসব ছিল, প্রীতিলতারও ছিল। কৈশোরে যৌবনে যেসব ইচ্ছাগুলি আসে মনের মধ্যে, যা পিছন থেকে টানে, তাঁদের মধ্যেও সেইসব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাড়ির বয়স্করা যখন দেশের কাজ ছেড়ে পড়াশুনা করতে বললেন, ঐ ছোট্ট ক্ষুদিরাম তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন, আমি দেশের কাজ করব, লেখাপড়া করব না, মানে স্কুল-কলেজে আমি এখন সময় দেব না। স্কুল-কলেজে অনেক ডিগ্রি অর্জন করে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তার চেয়েও অনেক বড় শিক্ষা তিনি কিন্তু দিয়ে গেলেন। এই বয়সেই সবকিছু ছেড়ে দেশের জন্য লড়ব এবং প্রাণ দেব, এই যে বোধ, সেটা অর্জন করা কত কঠিন।

আমরা যে পড়ি, জানি, কেন? জ্ঞান অর্জন করার জন্য তো? মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য তো? নাহলে পড়াশুনাটা কীসের জন্য? বিদ্যাসাগর দেশের জন্য

ভিক্ষা করে স্কুল করেছেন, তার জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। তিনি বলেছিলেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়।" পুরাতন প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? বিদ্যাসাগর দেখেছেন ধর্মের নামে অধর্ম, অনাচার, ব্যাভিচার, গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, জাতপাত এইসব চলছে। বিদ্যাসাগর দেখেছেন, সেযুগে এদেশে তিন বছর, পাঁচ বছরের শিশুকন্যার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৫০-৬০ বছরের বৃদ্ধের সাথে। আট বছরেই সে বিধবা হয়ে যাচ্ছে। কবে বিয়ে হয়েছে তাও জানে না, কবে বিধবা হয়েছে তাও জানে না। স্বামী মারা গেছে, সতীর দেবতা পতি, তাই মৃত্যুর পরেও স্বামীকে সেবা করতে হবে, ফলে একই চিতায় স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মার। রামমোহন-বিদ্যাসাগররা এইসব দেখেছেন। শাস্ত্রের বিধানে এক স্বামীর পঞ্চাশ, একশো স্ত্রী। তোমরা এখন এগুলো গল্পে পড়, কিন্তু এগুলোই সেদিন ছিল বাস্তব। এরকম ধর্মীয় বিধান, নানা কুসংস্কারে গোটা সমাজ একেবারে পচে যাচ্ছিল। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে রামমোহন নবযুগের সূচনা করলেন। এই নবযুগের সূচনা বলতে ইউরোপে নবজাগরণে প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানের আলো এদেশে নিয়ে এলেন। সেটা হচ্ছে সংস্কৃত শাস্ত্রের ধর্মান্ধতা নয়, ইউরোপের জ্ঞানের আলোকে সত্যের সন্ধান কর। আমরা বলি অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে প্রথম ঊষালগ্ন হচ্ছেন রামমোহন। ঊষা মানে হচ্ছে, রাত্রের অন্ধকার অপসৃয়মান, নতুন সূর্য আসছে, পূবের আকাশে অনেকটা রক্তিম আভা, এদেশে নবজাগরণের অভ্যুদয় লগ্ন — এরকম হলেন রামমোহন। এরপর বিদ্যাসাগর হচ্ছেন প্রথম উদ্ভাসিত রক্তিম সূর্যোদয়।

তোমরা অনেকে হয়তো জান না যে, বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না। পূজা মানতেন না, কোনও মন্দিরে যাননি। রামকৃষ্ণ এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর যাননি। রামকৃষ্ণ কিন্তু শ্রদ্ধা করেছেন বিদ্যাসাগরকে। বড় মানুষ হিসাবে বিবেকানন্দও তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন। এদেশে নবজাগরণ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বেশ কিছু বড় মানুষ আমরা পেয়েছি, বিদ্যাসাগর তাঁদের সকলের মধ্যে অনেক বড় ছিলেন। তাঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত করে বলেছিলেন, "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষও

বলতেন, সে যুগে এদেশে এতবড় মানুষ আর আসেনি, বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে না চিনলে, না বুঝলে তোমরা এক পাও এগোতে পারবে না। সেই বিদ্যাসাগর বলেছেন, নতুন মানুষের চাষ করতে হবে। অর্থাৎ রামায়ণ-কোরান-বেদ-বেদান্তভিত্তিক চিন্তা ভাবনা, অন্ধতা, অজ্ঞতা, গোঁড়ামির শৃঙ্খল থেকে মানুষের চিন্তাকে, বুদ্ধিকে মুক্ত কর, বিজ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত কর। ঊনবিংশ শতকে এদেশে ধর্মান্ধতার যুগে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রে সত্য পাওয়া যায় না, সত্য পাওয়া যায় বিজ্ঞানে, যুক্তিশাস্ত্রে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে — শিক্ষার আলোকে নতুন মানুষের চাষ অর্থাৎ নতুন মানুষ গড়া। যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন মনন গড়া, গণতান্ত্রিক মানুষ গড়া — যারা যুক্তির মূল্য দেবে, যারা বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে সত্যের সন্ধান করবে, যারা ধর্মভেদ জাতিভেদ বর্ণভেদ মানবে না, যারা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখবে, যারা নারীকে মর্যাদার চোখে দেখবে, পুরুষের দাসী হিসাবে দেখবে না। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তিনি নিয়ে এলেন। এই যে শিক্ষা তার মূল কথা হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ হও, মনুষ্যত্বের অধিকারী হও, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়, কোথাও মাথা নিচু করো না। এই বিদ্যাসাগর যিনি ভগবান মানতেন না, অথচ জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের জোরে এতবড় চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন যে, ঈশ্বর বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, তিলক, দেশবন্ধু, লালা লাজপৎ রায় এবং শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল রায়, প্রেমচাঁদ, নজরুল, সত্যেন বসু, মেঘনাথ সাহা, সি ভি রমন সহ এমন কেউ ছিলেন না, যিনি বিদ্যাসাগরের পদতলে মাথা নিচু করেননি।

বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবনটা কেটেছে চরম দারিদ্রের মধ্যে। সেগুলো তোমরা কেউ কেউ হয়তো জান। অনেক ছোট বয়সে তাঁকে বাবা কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন, পড়াশুনার জন্য। তাঁর বাবা অতি সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। কলকাতায় একটা ধনীবাড়ির আশ্রিত হয়ে খাটা পায়খানার পাশে বিদ্যাসাগররা থাকতেন। তোমরা ভাবতে পার, যখন খেতে বসতেন — পায়খানার পোকা আসত, জল নিয়ে বসতেন পোকা তাড়াবার জন্য। ঐ বাচ্চা বয়সে রান্না করতেন বাবার জন্য, ছোট ভাইদের জন্য। তাদের খাইয়ে কিছু থাকলে তবে খেতেন। কোনও দিন মাছ জুটলে একবেলা ঝোল দিয়ে খেতেন, একবেলা আলু দিয়ে খেতেন, আর পরের দিন মাছ দিয়ে খেতেন। ঘরে আলো জ্বালাবার তেল না থাকলে রাস্তায় ল্যাম্প পোস্টের তলায় বসে কষ্ট করে পড়তেন। এসব ভাবলে তোমাদের চোখে জল আসবে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। কলকাতা শহরের সমস্ত ধনী

ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে বিরাট খাতির করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু রাস্তার ধারের ফুটপাতের লোকের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদয়ের যোগ। তিনি যখন মেদিনীপুরের বাড়িতে যেতেন, প্রথম গরিব পাড়ায় ঘুরতেন। এইসব নিয়ে কত কাহিনী আছে। তখন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, জমিদার বাড়িতে বিদ্যাসাগর বসে আছেন গণ্যমান্য লোকেদের সাথে। টানা পাখা চলছে মাথার উপর। একজন দারোয়ান চিঠি নিয়ে এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে, দরদর করে ঘামছেন বৃদ্ধ দারোয়ান। বিদ্যাসাগর জোর করে তাকে পাশে বসালেন। সে বসবে না সংকোচে, এত গণ্যমান্য লোক বসে আছেন। তবুও বিদ্যাসাগর তাঁকে জোর করে বসালেন। তিনি কোনও রকমে একটু বসে উত্তর নিয়ে পালিয়ে গেলেন। আশেপাশের গণ্যমান্য লোকেরা খেপে গিয়ে বললেন, আপনি কোথাকার কোন দারোয়ানকে আমাদের সাথে বসিয়েছেন? বিদ্যাসাগর কত বড় মানুষ সেটা বোঝাবার জন্য তোমাদের এ ঘটনা বলছি। বিদ্যাসাগর বললেন, কোন মতে তোমাদের উত্তর দেব? তোমাদের মতে উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, এই দারোয়ান একজন কনৌজী ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণদের পায়ের ধুলি তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা মাথায় তুলে নিতেন। ভুলে যেও না ইনি গরিব হতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ। আর আমার মতে বিচার হচ্ছে — আমরা এখন ৪০০/৫০০ টাকা রোজগার করি, উনি পাঁচ টাকা রোজগার করেন। আমার বাবাও একদিন কলকাতা শহরে পাঁচ টাকা বেতনের চাকরি করতেন এবং তোমাদের অনেকের বাবাও সম্ভবত তাই করেছেন। এঁকে অসম্মান করলে আমার বাবাকেও করতে হয়। আর একবার ঘোড়ার গাড়ি করে সমাজপতিরা যাচ্ছেন, দেখছেন বিদ্যাসাগর ফুটপাতে বসে দোকানদারদের সঙ্গে গল্প করছেন, হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন। পরে সমাজপতিরা এজন্য তাঁকে ধরেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছেন, 'আমি তো ওদেরই লোক। তোমাদের ছাড়তে পারি, কিন্তু ওদের ছাড়তে পারিনা।' বিদ্যাসাগর খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'গরীবের দুঃখ কয়জন দেখেছে, কয়জন বুঝেছে তাদের হৃদয়ের ব্যথা।' মৃত্যুর আগে সবাই জোর করছিলেন, কার্মাটারে চেঞ্জের জন্য যেতে। তাঁর ঐতিহাসিক উত্তর ছিল, 'ওখানে গরীবরা দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরছে, আর আমি স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ভাল ভাল খাব, এ আমি সইতে পারব না।' তিনি গেলেন না। এই মানুষকে কেউ ভুলতে পারে? বিদ্যাসাগরের সারাটা জীবনে এরকম বহু ঘটনা পাওয়া যাবে। তাই সত্যিকারের শিক্ষা হচ্ছে মানুষ হওয়া, মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দও একই কথা বলেছেন — শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন(character building), মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া (man making) এবং সেই ধরনের জীবনের অধিকারী হওয়া (life building)।

সেজন্য আমি এটাই বোঝাতে চাইছি যে, কোনও স্কুলের পড়া না পড়েও ক্ষুদিরাম যথার্থ শিক্ষা, দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। দেশকে ভালোবাসা, দেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা — এটাই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা, সেই প্রয়োজনে সব কিছু দিতে প্রস্তুত হওয়া, হাসিমুখে জীবন দিতেও প্রস্তুত হওয়া — এই উপলব্ধি যখন ক্ষুদিরাম অর্জন করেছেন তখন দিদিকে বলেছেন, আমি স্কুলে গিয়ে আর সময় নষ্ট করতে পারব না। শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য, মূল লক্ষ্য সেটা অর্জন করেছেন বলেই এই কথাটা বলতে পেরেছেন। যেটা অনেক ডিগ্রি অর্জন করেও সকলে পারে না। তাঁকে এক জমিদার প্রস্তাব দিয়েছিল যে, আমাদের বাড়িতে থেকে তুমি পড়াশুনা কর। এই জমিদারের কাছে ক্ষুদিরামের বাবা চাকরি করতেন, হিসাবের গরমিলের অভিযোগে জমিদার তাঁর জমি ক্রোক করেছিল। বাবা মারা যাওয়ার পরে প্রমাণ হয় যে এটা ভুল অভিযোগ ছিল। অনুতপ্ত হয়ে সেই জমিদার ক্ষুদিরামকে জমি ফেরত দিতে চেয়েছিল। ক্ষুদিরাম বললেন, 'আমার সম্পত্তির দরকার নেই, আপনি ভালো কাজে সাহায্য দিন।' জমিদার বললেন, 'তাহলে আমার বাড়িতে থেকে তুমি পড়াশুনা কর।' ক্ষুদিরাম উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনার বাড়িতে থাকলে আমি বাবু হয়ে যাব। বাবু হয়ে গেলে দেশের কাজ করা যাবে না।' তোমরা একবার ভেবে দেখ, বলছেন বাবু হয়ে যাওয়া মানে বিলাসী হয়ে যাওয়া, বিলাসী হয়ে গেলে দেশের কাজ করা যাবে না। আবার যখন তাঁকে নেতারা মজফ্‌ফরপুরে পাঠাচ্ছেন, তিনি একবারও প্রশ্ন করেননি কী করে যাব, কে আমাকে নিয়ে যাবে, আমার সাথে কে থাকবে বা পুলিশ ধরলে কী হবে? আর যে নেতারা পাঠাচ্ছিলেন, তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করলেই বুঝতেন, ক্ষুদিরাম একাজের যোগ্য নয়। জিজ্ঞেস করেছিলেন পারবে? হ্যাঁ বলেননি, শুধু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কারণ, বুঝেছিলেন আমি এই কঠিন কাজের যোগ্য প্রমাণিত, এটা আমার গৌরব। দেশে এত ছেলে থাকতে নেতারা যে আমায় দায়িত্ব দিয়েছেন, এই তো আমার সত্যিকারের মর্যাদা। আমি বীর, আমি এ কাজের উপযুক্ত, এই মর্যাদা পেয়েছি। এই সেই আনন্দ। জজ রায় দিচ্ছে ফাঁসির, তিনি হাসছেন। জজ ভাবল ইংরেজি বোঝেনি, বাংলায় শোনাল, তখনও ক্ষুদিরাম হাসছেন। ফাঁসির মুহূর্তেও হাসছেন। 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি' কথাটা এমনি এমনি আসেনি। বিশিষ্ট বিপ্লবী শিল্পী কমরেড তাপস দত্ত ক্ষুদিরামের যে মূর্তিটি তৈরি করেছেন, তার মধ্যে সেই ভাব মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তখনকার কাগজে বেরিয়েছিল — যেন ফাঁসির মঞ্চে পুলিশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ক্ষুদিরাম। কোথায় পুলিশ তাঁকে টেনে নিয়ে যাবে তা নয়, পুলিশ পিছনে, ক্ষুদিরামই তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। সেটাই

পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে ঐ মূর্তির মধ্যে। তিনি বীরদর্পে এগোচ্ছেন। আবার শেষ সময়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ব্যঙ্গ করে গেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ফাঁসির দড়িতে মোম দেওয়া হয় কেন? প্রশ্নটা হচ্ছে হত্যা করার জন্য যে দড়ি, তাকে কোমল করার চেষ্টা কেন? মাত্র ১৮ বছর বয়সের একজন কিশোর — কতটা উন্নত চরিত্র, জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী হলে এটা সম্ভব! আমরা কত বক্তৃতা দিই, লিখি, অথচ এঁর থেকে কত কী শেখার আছে! অথচ ক্ষুদিরামের কোনও স্কুল-কলেজের ডিগ্রি ছিল না।

মাত্র ২৩ বছর বয়সে ভগৎ সিং-ও এভাবেই প্রাণ দিয়েছেন। ভগৎ সিংকে ব্রিটিশরা ধরতে পারেনি। ধরতে পারতও না। ব্রিটিশ সরকার ভগৎ সিং-এর নামে প্রাইজও ঘোষণা করেছিল। ধরিয়ে দিলে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দেবে। বিপ্লবীরা পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হ্যান্ডবিল দিয়েছিলেন — ভগৎ সিংকে ধরতে পারলে ২০,০০০ টাকা পুরস্কার দেব। ঐ অবস্থায় ভগৎ সিং লাহোর থেকে এসেছেন কলকাতায়। হাওড়া স্টেশনে গোরা পুলিশে, ভারতীয় পুলিশে ছয়লাপ। ভগৎ সিং সাহেবের ছদ্মবেশে বেরিয়ে এলেন। ভগৎ সিং-এর যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাও, সেটা ওনার সেদিনের সাহেবের টুপি পরা ছবি। ভগৎ সিং-এর সাহেবের মতো টুকটুকে রঙ ছিল। পুরোপুরি সাহেবের চেহারা ছিল। তাঁর সাথে একজন ছিলেন মেম সাহেবের পোষাকে, কোলে শিশু সন্তান। ইনি হচ্ছেন ভগৎ সিং-এর দাদা স্থানীয় একজনের স্ত্রী। তিনিও একজন মহীয়সী নারী। আমি তো আমাদের মহিলা কর্মীদেরও বলি তাঁর থেকে শিক্ষা নিতে। তাঁর স্বামীর বন্ধুরা বিপ্লবী। তাঁদের রান্না করে খাওয়াতেন। দুর্গা ভাবী বলে পরিচিত ছিলেন। হিন্দিতে ভাবী মানে বৌদি। তিনি ছিলেন ভগবতীচরণ ভোরার স্ত্রী। ভগৎ সিং-কে কলকাতায় পৌঁছে দিতে হবে, তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিলেন। স্বামী বাড়িতে ছিলেন না, ফলে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কারও অনুমতি না নিয়েই তিনি সেই যুগে কত রিস্ক নিয়ে ভগৎ সিং-কে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিলেন। আমি অবাক হয়ে আজও ভাবি — ব্রিটিশরা যদি চিনতে পারত ভগৎ সিং-কে তাহলে তারা দূর থেকে হলেও গুলি চালাত। একজন মা হয়ে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ভগৎ সিংকে নিয়ে যাচ্ছেন একথা জেনেও যে, যেকোনও সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারাও যেতে পারে। তোমরা ভাব, কী স্তরের মা ছিলেন। এ দেশেই তো এরকম কিছু নারী চরিত্র একদিন তৈরি হয়েছিল! এভাবে কলকাতায় এলেন ভগৎ সিং, আবার ফিরেও গেলেন। কিন্তু পরে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন কেন? ব্রিটিশরা ও গান্ধীবাদীরা রটিয়ে দিয়েছিল ভারতবর্ষে বিপ্লবী আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। সেই সময় অ্যাসেম্বলিতে আইন পাশ হচ্ছিল শ্রমিকদের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য। তার প্রতিবাদে একটা হ্যান্ডবিল বণ্টন

এবং বিপ্লবী আন্দোলন বেঁচে আছে এটা প্রমাণ করার জন্য ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত আইনসভায় বোমা ফাটালেন। এই বোমায় কেউ মারা যায়নি, তাঁরা কাউকে মারতেও চাননি। ভয়ে পালাতে গিয়ে কিছু সাহেব চেয়ারের ধাক্কায় একটু আহত হয়েছে মাত্র। ভগৎ সিং-রা পালাবার চেষ্টা করেননি। ধরা দিয়েছেন, কোর্টে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে ও শ্রমিক বিপ্লবের পক্ষে বক্তৃতা দেবেন বলে। যে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন তা আজও ঐতিহাসিক সম্পদ হয়ে আছে। এভাবে বহু যুবককে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। আর একটা ঘটনা, ফাঁসির আদেশ যখন হল, ভগৎ সিং-এর বাবা একটা পিটিশান লিখেছিলেন, ইংরেজদের কাছে ছেলের জীবন ভিক্ষা করে। ভগৎ সিং-এর বাবাও ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের লোক, গান্ধীবাদী। পিটিশনের কথা শুনে ভগৎ সিং বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন — আমাকে জীবনে যে দুঃখ কেউ দিতে পারেননি, আপনি বাবা হয়ে সেই দুঃখ দিলেন, আমার বাবা হয়ে ইংরেজদের কাছে জীবন ভিক্ষা করলেন! এতবড় শাস্তি আমাকে কেন দিলেন? খুবই ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। চিঠিতে লিখেছেন — দু'দিন বাদে আমি আর থাকব না। ছোটবেলায় আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, আপনাকে আমি দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু অনেক দুঃখে এই কথাগুলি লিখলাম। এখানে আমার ভাষায় ভগৎ সিংয়ের মূল কথাটা বলছি।

একজন বৃদ্ধ গান্ধীবাদী জেলে কিছুদিন ভগৎ সিংয়ের সাথে ছিলেন। ফাঁসির দু'দিন আগে তাঁকে পরামর্শ দিলেন — তুমি তো এতদিন ভগবান মাননি, অন্তত মৃত্যুর আগে গীতাটা পড়। এ বিষয়ে ভগৎ সিংয়ের একটা বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে — 'কেন আমি নাস্তিক' এই নামে। লিখেছেন, সারা জীবন আমি যে ভগবানকে মিথ্যা বলে বুঝেছি, মরবার সময় তাকে স্মরণ করতে চাই না,আমি মিথ্যাচার করতে চাই না, ভণ্ডামি করতে চাই না। মহান বিপ্লবী নেতা লেনিনের পুস্তক হচ্ছে আমার কাছে গীতা, সেটা আমি পড়ছি। ফাঁসির আগে আর একটা কথা তিনি বলেছিলেন —সুন্দর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার ছিল। একথা আমি গোপন করতে চাই না। কিন্তু কারারুদ্ধ শৃঙ্খলিত জীবন আমি চাই না। আমি এই আশা নিয়ে সানন্দে ফাঁসির রজ্জু গলায় নিচ্ছি — একদিন ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে মায়েরা চাইবেন, তাঁদের কোলেও ভগৎ সিংরা যেন জন্ম নেয়। ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে এক ইংরেজ অফিসারকে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন — তুমি ভাগ্যবান, কারণ তুমি দেখবে কীভাবে ভারতবাসী দেশের মুক্তির জন্য হাসিমুখে ফাঁসিতে প্রাণ দেয়। এদেশে তিনিই প্রথম বিপ্লবী যিনি ফাঁসির মুহূর্তে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান ধ্বনিত করেছিলেন। এই ভগৎ সিংয়ের অন্য কী সম্পত্তি ছিল, কী তাঁর ধনদৌলত ছিল, কটা গাড়ির মালিক ছিলেন তিনি? কিন্তু

তিনি কি মৃত? তাহলে কেন আমরা ২৩শে মার্চ প্রতি বছর উদযাপন করি?

মাত্র ২১ বছর বয়সে প্রীতিলতা কেন প্রাণ দিলেন? সে সময় ভারতবর্ষে একটা কথা উঠেছিল — ছেলেরা পারে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রাণ দিতে, মেয়েরা পারে না? প্রীতিলতা মাস্টারদাকে বললেন আমি এই লড়াইয়ে যাব। আপনি আমাকে দায়িত্ব দিন। আমি কিন্তু ফিরে আসব না। তিনি লিখে গেছেন, আমি প্রাণ দিলাম এটা প্রমাণ করার জন্য যে মেয়েরাও বিপ্লবী আন্দোলনে প্রাণ দিতে পারে। তোমরা মনে রাখবে, ইনি খুব অভাবী পরিবারের মেয়ে, বাবা সামান্য চাকরি করতেন। প্রীতিলতা পাশ করে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁর আত্মদানের পর বাবার চাকরি চলে গেল, মা বাড়ি বাড়ি দাই মায়ের কাজ করে সংসার চালাতেন। এই দুঃস্থ পরিবারকে পেছনে রেখেই তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। এই যে চরিত্রগুলো, এই যে জীবনগুলো, এঁরা কীসের জোরে আজও বেঁচে আছেন? যাঁরা সত্যিকারের মানুষ তাঁরা কেন এঁদের শ্রদ্ধা জানায়? এমনকী এঁদের বাদ দিলে কমরেড শিবদাস ঘোষকেও আমরা পেতাম না।

যুগ যুগ ধরে যত বড়মানুষ এদেশ এবং বিদেশে এসেছেন, স্বদেশি আন্দোলনে যত বড়মানুষ ও বড় বিপ্লবী এসেছেন, বড় সাহিত্যিক, সমাজসেবক এসেছেন, তাঁদের সকলের চরিত্র থেকে, সকলের জীবন থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ শিক্ষা নিয়েছেন। আবার এ যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে তিনি শিক্ষা নিয়েছেন। মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং — এঁদের সকলের থেকে তিনি শিখেছেন। এই সবটা নিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। কমরেড নীহার মুখার্জী কমসোমলের একটা লেখায় অল্পকথায় কমরেড শিবদাস ঘোষের কৈশোরের কিছু ঘটনা লিখেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ গরিব পরিবারের সন্তান ছিলেন। পরিবারের বড় ছেলে ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ফলে তিনি পরিবারেরও আশা-ভরসা ছিলেন। ছোটবেলায় কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা, সুভাষ বোস — সবারই প্রভাব পড়েছে। তার মধ্য দিয়েই স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সাথে তিনি যুক্ত হলেন। মাত্র ১৩-১৪ বছর বয়সে অনুশীলন সমিতিতে তিনি যোগ দেন। সেই বয়সেই তিনি গড়ে তুলেছেন ছোট ছোট কিশোরদের নিয়ে ব্যায়ামাগার। দেশের জন্য স্বাস্থ্য চর্চা করা তখনকার দিনে বিপ্লবীদের একটা কাজ ছিল। নেতারা বন্যায় খরায় মহামারীতে কমরেড শিবদাস ঘোষ এবং তাঁর সমবয়সী সাথীদের নানা সেবামূলক কাজে পাঠাতেন। এইভাবে তিনি বিপ্লবী রাজনীতির সাথে আরও

ঘনিষ্ঠ হলেন। কমরেড ঘোষ পড়াশুনায় খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়ায় রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে দেখে মাস্টারমশাইরা দুঃখ পেয়েছেন, ভালোবাসতেন বলে ভর্ৎসনাও করেছেন। মাত্র কয়েকমাস পড়ে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করলেন। মাষ্টারমশাইরা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু সেই শেষ। স্কুল জীবনের পরবর্তীকালে আর তিনি প্রথাগত শিক্ষায় যাননি। বিপ্লবী আন্দোলনে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, কেন আমরা এই পথে এলাম? তার উত্তরে তিনি যা বলেছেন, সেটা তাঁর জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধ্রুব সত্যের মতো কাজ করেছে। তিনি বলেছেন, পশু আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পশুও খাদ্য সংগ্রহ করে, পশুও কষ্ট পায়, পশুও শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় আশ্রয় খোঁজে, পশুরও জৈবিক তাড়না আছে, জৈবিক নিয়মে বংশবৃদ্ধিও করে। মানুষেরও খাদ্য চাই, আশ্রয় চাই, বাসস্থান চাই, মানুষের মধ্যেও জৈবিক নিয়মে বংশবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু পশু চিন্তা করতে পারে না, পশুর বুদ্ধি নেই। মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাভাবনাটা শুধু কি এইজন্য যে, যেখানে পশু বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে খাদ্য, আশ্রয়, জৈবিক তাড়না চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতির সাথে লড়াই করে অন্ধভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মের দাস হয়ে, কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করতে পারে না, সেখানে শুধু একই কাজগুলি করবে কি মানুষ নিছক বুদ্ধিবৃত্তির জোরে? তাহলে উভয়ের পার্থক্য কোথায়? বাস্তবে পার্থক্য দাঁড়ায়, ওরা বুদ্ধিহীন পশু আর মানুষ বুদ্ধিমান পশু! এইটাই কি পার্থক্য হবে? তবে তো মানুষ আর পশুতে বিশেষ কোনও পার্থক্যই থাকে না। কমরেড ঘোষ বললেন, না, পার্থক্য আছে। এই বুদ্ধিবৃত্তির জোরেই একমাত্র মানুষই প্রকৃতিকে জয় করে এগোচ্ছে, সমাজ সভ্যতা গড়ছে ও পাল্টাচ্ছে, যা অনেক বলবান পশুরাও পারেনি। বললেন, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, বিবেক-মনুষ্যত্ব, দায়িত্ব-কর্তব্য, স্নেহ-মমতা — এসব হচ্ছে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পশুজগতে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা নেই, দয়া-মায়া নেই, ন্যায়-নীতিবোধ-কর্তব্যবোধ নেই, চরিত্র নেই, সত্য-মিথ্যা নেই, মনুষ্যত্ব নেই। এইখানেই পার্থক্য পশুতে আর মানুষে। এজন্যই কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, শুধু বেঁচে থেকে লাভ কী? হয় প্রাকৃতিক নিয়মে পশুর মতোই বাঁচব এবং পশুর মতোই মরব, না হয় মনুষ্যত্ব নিয়ে, ন্যায়নীতিবোধ নিয়ে, উন্নত চরিত্র নিয়ে মানুষের মতো বাঁচব এবং মৃত্যুবরণ করব। এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আছে যথার্থ মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার তাৎপর্য। এই বিচারকে ভিত্তি করেই একদল বেঁচে মরে থাকে, আর একদল মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে। যারা শুধু ধনদৌলত, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ঐশ্বর্য, লাভ, লালসার পেছনে ছোটে,

প্রবৃত্তির তাড়নায় ছোটে, তারা বেঁচেও মরে থাকে। আর একদল মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচেন, তাঁরা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকেন — পার্থক্যটা এখানেই। কয়েক হাজার বছর আগের বুদ্ধের নাম আজও মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করে! তাঁর অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই যৌবনেই পিতামাতা, রাজসিংহাসন, স্ত্রী-শিশু সন্তানকে ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন মানুষের দুঃখ দুর্দশায় গভীর বিচলিত হয়ে, একেবারে ভিখারির বেশে রাস্তায়। এটাই তো ইতিহাস। প্রত্যেক বড় মানুষের ক্ষেত্রেই দেখ, তাঁদের যুগের যত অন্যায় অত্যাচার, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁরা হচ্ছেন জ্বলন্ত প্রতিবাদ। তাঁরা অনাহারে দিন কাটিয়েছেন, জেলে কাটিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন জীবদ্দশায় যাঁদের মানুষ চিনতেও পারেনি। যেমন ক্ষুদিরামের যখন ফাঁসি হয়েছে তখন কয়টা ওয়ালিং হয়েছিল পশ্চিমবাংলায়-ভারতবর্ষে? কয়টা পোস্টারিং, স্ট্রিট কর্নার মিটিং, মিছিল হয়েছিল? এর প্রতিবাদে কি ধর্মঘট হয়েছিল ১৯০৮ সালে? আজকাল আমাদের কেউ অ্যারেস্ট হলে তো আমরা মিটিং মিছিল করি। আর সেই যুগে বিপ্লবীদের বলা হত ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। তখন একটা কথা চালু ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। আর বলত, এরা পাগল! পাগল না হলে এসব কেউ করে! এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়!

মজফ্‌ফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় ক্ষুদিরামকে পুলিশ ধরতে পারত না। দৌড়োতে দৌড়োতে তৃষ্ণার্ত হয়ে একটা গ্রাম্য দোকানদারের কাছে ক্ষুদিরাম জল চেয়েছেন, ততক্ষণে হুলিয়া বেরিয়ে গিয়েছে। সেই দোকানদারই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। এই ছিল সেদিন অধিকাংশ দেশবাসীর অবস্থা! ক্ষুদিরামের আর এক সঙ্গী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। মোকামা স্টেশনে একজন বয়স্ক লোক মোট বইতে পারছে না দেখে তিনি তার উপকার করতে গিয়েছিলেন। আসলে যাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন সে ছিল একজন শয়তান পুলিশ অফিসার। সেই-ই প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ অ্যারেস্ট করার আগেই প্রফুল্ল চাকী নিজের মাথায় রিভলভারের গুলি চালিয়ে আত্মদান করলেন। এভাবে আত্মদান করে এই ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীরা যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন ১৯০৮ সালে, সেই শিখাই জ্বলতে জ্বলতে পরবর্তীকালে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' — এই গানটা কে লিখেছিলেন, কে সুর দিয়েছিলেন, কেউ জানে না। ধীরে ধীরে সেই গান সেদিন কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে গিয়েছিল, কত ক্ষুদিরাম হওয়ার স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল। কিছুদিন বাদে গোটা দেশের সামনে একটা আদর্শ হিসাবে এসে গেল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীদের নিয়েই 'পথের দাবী'র বিপ্লবী নায়ক 'সব্যসাচী'

যুব মনে দুর্নিবার বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে গেল। এইভাবে একটা ধারা চলে এল। প্রথম দিকে বড় মানুষরা, বিপ্লবীরা যখন প্রাণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁদের অনেকেরই সমর্থনে দাঁড়াবার কেউ ছিল না। যাদের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন, তারাও অনেকসময় এঁদের বুঝতে পারেনি, চিনতে পারেনি! এঁদের অনেক সময় কত কুৎসা শুনতে হয়েছে! বিদ্যাসাগরকেও কম নিন্দা সহ্য করতে হয়নি। কত কুৎসা, কত অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে! তা সত্ত্বেও তাঁরা মনুষ্যত্বের জোরে, আদর্শের জোরে লড়ে গেছেন।

আগেই তোমাদের বলেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষ হলেন এদেশের ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সকল বড় মানুষদের প্রতিনিধি। সমস্ত বড় মানুষ ও বিপ্লবীদের অপূর্ণ স্বপ্ন দেশকে যথার্থ মুক্ত করা, শোষণ-অত্যাচার থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করার কাজটি তিনি সফল করতে চেয়েছিলেন। আর এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, এই শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্তি — একমাত্র এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আদর্শ মার্কসবাদের দ্বারাই সম্ভব। ফলে মার্কসবাদকে তিনি গ্রহণ করলেন এবং আয়ত্ত করলেন। তার ভিত্তিতে তিনি বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করলেন। একটা কথা তিনি বলেছিলেন, আমাদের এই রাজনীতি এম এল এ, এম পি হওয়ার জন্য নয়, মন্ত্রী হওয়ার জন্য নয়, কাগজে নাম তোলার জন্যও নয়। এ রাজনীতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়ে লড়বার জন্য। বলতেন, বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া মানেই হল মৃত্যুর টিকিট কাটা, যেমন করে ক্ষুদিরামরা মৃত্যুর টিকিট কেটে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। যে কোনও সময় প্রাণ দিতে হবে, এজন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলে কেন আমরা এ পথে এলাম? বলছেন, মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচব, মর্যাদা নিয়ে বাঁচব বলে। আর একটা কথাও তিনি বলতেন, মর্যাদা হারিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? মর্যাদা মানে আমি কত উঁচু চেয়ারে বসলাম, আমার নামের পাশে কত খেতাব থাকল, আমার কত ছবি কাগজে বেরোল — এসব নয়। মর্যাদা কথার অর্থ কী? অনেক সময় অনেকে বলে, আমাকে ওরা মর্যাদা দেয়নি বা আমার মর্যাদা নষ্ট করেছে। সেটা হচ্ছে, আমাকে চেয়ারে বসতে দেয়নি, আমার বদনাম করেছে, আমাকে প্রণাম করেনি, আমাকে সেলাম করেনি, এইসব। এটা হচ্ছে মিথ্যা মর্যাদাবোধ, ঠুনকো মর্যাদাবোধ। আর একটা মর্যাদা হচ্ছে এই — আমি একটা মহৎ আদর্শ, একটা মহৎ মূল্যবোধকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছি, জীবনে রূপায়িত করার জন্য লড়ছি — এটাই আমার যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধ। আমি যে আদর্শকে গ্রহণ করেছি, যে আদর্শকে আমি মর্যাদা দিই, যে আদর্শের ভিত্তিতে আমার বিবেককে আমি জাগিয়েছি, আমি চরিত্র গঠন করছি, সেই আদর্শকে আমি যদি দুর্বলতায়, ভয়ে, লোভে,

কোনও কারণে আঘাত করি, তাহলে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করা হয়। ব্রিটিশরা ক্ষুদিরামের হাতে হাতকড়া দিল, মুখে কালি দিল, এতে তাঁকে অসম্মান করা হল কি? ব্রিটিশের সাধ্য কী তাঁকে অসম্মান করে? কোনও বিপ্লবীকে, কোনও বড় মানুষকে অপরে অসম্মান করতে পারে না। সত্যিকারের যে আত্মসম্মানের অধিকারী অপরে তাকে অসম্মান করতে পারে না। ফলে এভাবে বিচার করা ভুল। চেয়ারে বসাক আর মাটিতেই বসাক, তাতে কিছু যায় আসে না। একমাত্র আমিই আমার মর্যাদাকে নষ্ট করতে পারি। যে অত্যাচারী শাসকেরা যিশু খ্রিস্টকে দণ্ডদান করেছিল, যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তারাই তো ইতিহাসে ঘৃণ্য, অসম্মানিত, আর যিশু খ্রিস্ট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। তাই কমরেড ঘোষ বলে গেছেন, যে আদর্শকে আমি শ্রদ্ধা করি, কোনও লোভে কোনও স্বার্থে সে আদর্শকে যদি লঙ্ঘন করি, তাহলে আমি নিজেই আমার আত্মমর্যাদা নষ্ট করলাম। ফলে অপরে আমার মর্যাদা নষ্ট করতে পারে না, যদি আমি আমার মর্যাদা নষ্ট না করি। এই হল কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। একথা তোমরা মনে রেখো।

কমরেড ঘোষ বলছেন, ভালো খাবার চাও, ভালো জামাকাপড় চাও, জীবনে যা কিছু চাও — মর্যাদা হারিয়ে চেয়ো না, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে চেয়ো না। মর্যাদাই যদি চলে গেল তবে কী পেলে? মর্যাদা হারিয়ে তুমি টাকা পেয়েছ, বাড়ি পেয়েছ, গাড়ি পেয়েছ, অনেক স্ফূর্তির সুযোগ পেয়েছ — এটা পাওয়া নয়, এটা হারানো। যদি তোমার বিবেক থাকত, তাহলে বুঝতে যে তুমি হারিয়েছ, পাওনি। আর একজন ফাঁসির মঞ্চে যা পেয়ে গেল, অনাহারে মরতে মরতে যা পেয়ে গেল, তুমি এসব অনেক কিছু পেয়েও তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারনি। আদর্শের জন্য লড়তে গিয়ে বিপ্লবীরা অনাহারে মারা গিয়েছেন, গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছেন, কারাগারে নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু মাথা নিচু করেননি। এভাবে ইতিহাসে তাঁরা মাথা উঁচু করেই আছেন। ফলে মাথা নিচু করবে না কখনও। কাপুরুষতা, ভয় ভীতি, লোভ মানুষকে ছোট করে। সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য, ন্যায়ের জন্য, যে কোনও আঘাত আসুক, অত্যাচার আসুক, নির্যাতন আসুক, বীরের মতো তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও। সুভাষ বোস বলছেন, 'ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, স্কুলে কলেজে, যেখানেই অন্যায় অত্যাচার দেখবে — বীরের মতো প্রতিবাদ কর'। বলছেন, 'আমি আমার জীবনে যদি কিছু অর্জন করে থাকি তা এভাবে অর্জন করেছি'। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতেও যখনই অন্যায় কিছু দেখেছি, স্কুলে দেখেছি, কলেজে দেখেছি, রাস্তায় দেখেছি — সেখানেই আমি তার প্রতিবাদ করেছি। কখনও আটকাতে পেরেছি, কখনও পারিনি। কিন্তু আমি পালাইনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ ছোটবেলা থেকেই এসব

থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।

কমরেড ঘোষ বলেছেন, আমরা এপথে এলাম উন্নত মনুষ্যত্ব নিয়ে মর্যাদাময় জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম বলে, জ্ঞাতসারে অন্যায়ের সাথে, মিথ্যার সাথে আপস করতে চাইনি বলে। আর বলেছেন হৃদয়বৃত্তির জন্য এসেছি। নামের জন্য নয়, পরিচয়ের জন্য নয়, প্রচারের জন্য নয়, কোনও পোস্টের জন্যও নয় — লড়াই করেছি, কাজ করেছি কোটি কোটি জানা অজানা মানুষকে ভালোবেসেছি বলে। এজন্যই বলেছেন, বিপ্লবী রাজনীতি হল উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। উচ্চতর ভালোবাসা না থাকলে এই পথে আসাই যায় না। এপথে অনাহারে থাকা আছে, ফুটপাতে থাকা আছে, জেলে যাওয়া আছে, মার খাওয়া আছে, গুলিতে প্রাণ দেওয়া আছে, ফাঁসিতে প্রাণ দেওয়া আছে। পরিবারেও প্রিয়জন বাবা মা ছোট ভাইবোন আছে, তাদেরও দুঃখ কষ্ট আছে। কিন্তু তাদের জন্য আমি চাকরি করছি না, দেশের কাজ করছি, বিপ্লবের কাজ করছি। এই পথে আমার পরাজয়ের পর পরাজয় আছে। এই পথে আমার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা আছে। যাদের সঙ্গে এককালে বিপ্লবী রাজনীতি শুরু করেছি তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেছে, লোভে অন্যদলে চলে গেছে, পুলিশের এজেন্ট হয়ে গেছে। এ সবই আছে। তা সত্ত্বেও আমাকে চলতে হবে, এগোতে হবে। কারণ কোটি কোটি মানুষের চোখের জল আমার বুকে জমা আছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, আমার নিজের বাবা মা, তাঁদের চোখের জল আর ফুটপাতে যে বৃদ্ধ মায়েরা, বৃদ্ধ বাবারা ভিক্ষা করেন তাঁদের চোখের জলের কোনও পার্থক্য আমি দেখিনি। আমার বাবা মায়ের চোখের জলে যেমন এঁদের চোখের জল দেখেছি, তেমনি এঁদের চোখের জলেই আমার বাবা মায়ের চোখের জল দেখেছি। এঁরাও তো কারুর না কারুর বাবা মা। আমার মা আমাকে কোলে করে যা কষ্ট করেছেন, আমার বাবা যা কষ্ট করেছেন, এঁরাও তো কাউকে না কাউকে নিয়ে একইভাবে কষ্ট করেছেন। তাহলে সেই মাতৃত্ব-পিতৃত্বের প্রতি তো আমার দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। ফুটপাতের বাচ্চাগুলোও তো আমার ভাই-বোন। এরাও তো আমার সন্তান। এই যে হৃদয়বৃত্তি, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জানা-অজানা মানুষের প্রতি ভালোবাসা, তা একজন বিপ্লবীকে ঘুমোতে দেয় না, অস্থির করে তোলে, থামতে দেয় না, দায়িত্ব পালন না করে সে থাকতে পারে না।

নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম আয়েসই যদি সবচেয়ে বড় হয়, তাহলে তো নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যাব, অপরে আমাকে কী ছোট করবে! যা করা উচিত বিবেকের তাড়নায় তা করছি না, ন্যায়-নীতিবোধ যা করতে বলছে, সেটা করছি না, লোভে লালসায়, ভয়ে ভীতিতে তা করতে পারছি না, করা উচিত

বুঝছি তবুও করতে পারছি না, — এর ফলে বিবেক দংশনে অস্থির হয়ে যাচ্ছি, নিজের অপরাধের গ্লানিতে নিজের কাছেই জর্জরিত হচ্ছি — ফলে আমাকে লড়াই করতেই হবে। সুভাষ বোস তো বড়লোক বাড়ির ছেলে ছিলেন, তিনতলা বাড়ির ছেলে, গাড়ি করে স্কুলে যেতেন। তিনি বলছেন, "কলকাতায় আমাদের বাড়ির সম্মুখে বসে এক জবুথবু বৃদ্ধা ভিখারী মহিলা প্রতিদিন ভিক্ষা করত। যতবার আমি বাইরে যেতাম বা বাড়ি ফিরতাম, তাকে না দেখে পারতাম না। যখনই তাকে দেখতাম বা এমনকি তার কথা চিন্তা করতাম, তার করুণ মুখখানি আর তার ছিন্ন বস্ত্র আমাকে যন্ত্রণা দিত। পাশাপাশি, নিজেকে এত স্বচ্ছল ও সুখী মনে হত যে আমি অপরাধী বোধ করতাম। আমার মনে হত — তিনতলা বাড়িতে বাস করার মত এরূপ ভাগ্য লাভ করার কি অধিকার ছিল আমার, যখন এই নিঃস্ব ভিখারী মহিলাটির মাথার উপরে কোনও আচ্ছাদন এবং প্রকৃতপক্ষে কোন খাদ্য বা বস্ত্র জুটত না? পৃথিবীতে এত দুঃখ যদি থেকে যায় তাহলে যোগের কি মূল্য? এরকম চিন্তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।" এখানেও দেখ, কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই উক্তির তাৎপর্য, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। এক এক করে সমস্ত বড় মানুষের জীবনে খোঁজ কর, সর্বত্রই পাবে এই উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির কারবার। বুদ্ধদেব রাস্তায় দেখেছেন মানুষ জরাগ্রস্ত, অনাহারে মরছে, শোকার্ত, যা দেখে সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। যিশু খ্রিস্ট, হজরত মহম্মদের জীবনও তাই। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও তাই। এ ধরনের কারণেই তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। শরৎচন্দ্রকে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দিচ্ছে, শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে, তখন তিনি বলছেন, 'ভাবছি এর কতটা আমার প্রাপ্য! কৃতজ্ঞতা কি শুধু আমার পূজনীয় অগ্রজদের কাছেই?' এই অগ্রজরা কারা? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ — এঁরা। বলছেন, শুধু এঁদের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা? তার পরেই শরৎচন্দ্র বলছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, — এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেচি অবিচার, কত দেখেচি কুবিচার, কত দেখেচি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।" নজরুলের আমার কৈফিয়ত কবিতাতেও পাবে একই কথা।

আর একটা কথাও কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বলেছেন — আমি

পারব কিনা, আমার দ্বারা হবে কিনা, এসব ভাবতে নেই। বলেছেন, আমি কীভাবে শুরু করেছি? আমি গ্রামের ছেলে ছিলাম, কৈশোরেই স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারায় যুক্ত হয়েছিলাম। স্কুলের পর কলেজে যাইনি। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, সত্য বলে যা বুঝেছি, সেটা করব, যত বাধাই আসুক না কেন। বলেছিলেন, ছোটবেলায় পড়েছিলাম বিদ্যাসাগরের শিক্ষা, সকলে পারিবে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা। আর আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, অপরে ভাবে পারিবে না যাহা, বিপ্লবের জন্য আমি করিব তাহা। বলেছিলেন, অসম্ভব বলে বিপ্লবীর কাছে কিছু নেই। বলেছিলেন, প্রতিভা, ক্ষমতা নিয়ে কেউ জন্ম নেয় না। সঠিক আদর্শ গ্রহণ করে, সঠিক পদ্ধতিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাত্মক সংগ্রামের পথে একজন ব্যক্তি প্রতিভা, ক্ষমতার অধিকারী হয়। ফলে যথার্থ বড় হতে গেলে তোমাদের কী কী চাই? চাই উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি, কোটি কোটি জানা অজানা শোষিত-অত্যাচারিত মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ, চাই সঠিক বিপ্লবী আদর্শ, আর চাই কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোবল, চাই সৎসাহস, চাই নির্ভীকতা, আর সত্যের জন্য সবকিছু দেওয়ার মানসিকতা। আরও কিছু চাই। সেগুলি হচ্ছে, সুস্থ সবল শরীর, যে শরীর দিয়ে রোগের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে, অনেক কষ্ট স্বীকার করতে পারবে। যারা অন্যায় করছে তাদের বিরুদ্ধে যে শরীর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে, পুলিশি নির্যাতন সহ্য করতে পারবে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম করবে। আর দরকার জ্ঞান-বুদ্ধি, যা দিয়ে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা যৌক্তিক কোনটা অযৌক্তিক, কোনটা সত্যরূপী মিথ্যা, কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় — এসব বুঝতে পারবে। এর জন্য নিরন্তর জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। আর চাই দৃঢ় চরিত্র। যা যুক্তি দিয়ে বুঝি, সেখানে মুখের কথা, মনের কথা, আর কাজ এক। কোনও পার্থক্য নেই। বলি একরকম, আর করি আর একরকম, এরকম যেন না হয়। যা ঠিক মনে করি, সেটাই বলি, সেভাবেই করি। ভয়, ভীতি, স্বার্থ, লোভ আমাকে আটকাতে পারে না। যুক্তি দিয়ে যা বুঝেছি, সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে, সমস্ত দুর্যোগ-সংকটের মধ্যেও তা নিয়ে যেন চলতে পারি, লড়তে পারি। লোভ লালসা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, নোংরামি, অন্যায়, যা নিয়ে আমাদের প্রবৃত্তি, তাকে দমন করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে পরাস্ত করে আমি সত্যিকারের ভূমিকা যেন পালন করতে পারি। এটাই তো চরিত্র। এটাই আমার জীবন ধর্ম। যেমন আগুনের ধর্ম হচ্ছে যা কিছু পায় দহন করে, পুড়িয়ে দেয়। জলের যা ধর্ম, জল সে কাজটা করে। এটাকেই বলে তাদের ক্যারেকটার, তাদের চরিত্র। আগুনের চরিত্র, জলের চরিত্র, সীসার চরিত্র, লোহার চরিত্র — একেকটার একেকটা ধর্ম, একেকটা চরিত্র। সমাজেও এরকমই একেকজন মানুষের এক এক রকমের চরিত্র। লোভীর চরিত্র, স্বার্থপরের চরিত্র, আবার

নির্লোভ চরিত্র, সবই আছে। একজনের চরিত্রে নিঃস্বার্থপরতা, পরোপকারবৃত্তি, সাহসিকতা, আর একজনের চরিত্রে ভীরুতা, স্বার্থপরতা থাকে। আবার বস্তুর চরিত্র বা বস্তুর ধর্মের সঙ্গে মানুষের চরিত্র বা ধর্মের একটা পার্থক্যও আছে। মানুষের চরিত্র জন্মগত নয়। অন্য প্রাণী তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়। কিন্তু মানুষ দৈহিক চরিত্র, বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মালেও মনের চরিত্র, মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মায় না। এগুলি সঠিক পথে কঠোর সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়। যেমন অভিজ্ঞতা জন্মগত নয়, জ্ঞান জন্মগত নয়। এগুলো লড়ে অর্জন করতে হয়। চরিত্রের যা মহৎ দিক, ভালো দিক সেগুলো অর্জন করতে নিজেকে ভেঙে গড়তে হয়। যুক্তি ও জ্ঞান দিয়ে যা বুঝি, তা যখন আমাদের জীবনের চলার পথে ক্রিয়া রূপে, আনন্দ রূপে স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল, গতির ছন্দ হয়ে দাঁড়ায়, যখন এ নিয়ে বিবেক আর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব থাকে না, তখনই তা চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এটা অর্জনের জন্য নিজের ভিতরে বাইরে অনেক লড়াই করতে হয়, নিজেকে ভেঙে গড়তে হয়, নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়, না হলে এক সময়ের অর্জিত উন্নত চরিত্রও বাঁচে না, তাকে রক্ষা করতে হয়।

আর একটা বিষয় বলছি। যে কোন বাড়িতে শিশুরা সকলের আদরের। সকলেই তাদের স্নেহের চোখে, আদরের চোখে দেখে। এর মূল যে কারণ সেটা হল, বয়স্করা মনে করেন, তাঁরা যখন থাকবেন না, তাঁরা যা কিছু সৃষ্টি করে যাবেন, রেখে যাবেন, তাকে রক্ষা করা এবং তাকে আরও ব্যাপক করার কাজটা ছোটরা যখন বড় হবে, তখন তারাই করবে। তাই ছোটরা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। মনে রাখবে, পৃথিবীতে মানুষ আসার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সমাজ গড়ে ওঠেনি, ন্যায়নীতি বোধ, কর্তব্যবোধ, পরিবার এসব আসেনি। মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক আসেনি। আদিম যুগে মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে এসেছিল, তখন মানুষের মস্তিস্ক বা চিন্তাশক্তি থাকলেও নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মনুষ্যত্ব এসব আসেনি। মানুষ অনেকটা পশুর মতোই ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে শিশু জন্ম নিত, কিছু বাঁচত, অনেকেই মরত, কেউ খোঁজও নিত না। তখন কিন্তু আজকের মতো অপত্য স্নেহ ছিল না। পরবর্তীকালে সমাজ যখন এল, সভ্যতা যখন এল, মনুষ্যত্ব, বিবেক, মমতা, ভালো-মন্দবোধ এসব আসতে শুরু করল। তার সাথে এই মনটাও এল, এই শিশুদের যত্ন করে গড়ে তুলব, এরাই ভবিষ্যৎ। আমরা বড়রা যা করলাম, সেই অভিজ্ঞতা, সেই শিক্ষা এদের হাতে দিয়ে যাব। এরা বড় হয়ে আমাদের চেয়ে আরও বড় কাজ করবে। এটা বড়রা ছোটদের কাছে সবসময়ই প্রত্যাশা করেন। পরিবারের বাবা-মা'রাও এটাই আশা করেন। আমরা যা পেরেছি আর যা পারিনি, আমার ছেলেমেয়েরা যেন তা করে। সেভাবেই তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

ভবিষ্যতে পারুক না পারুক, হয়ত সেরকম হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তবু সেই আশায় চেষ্টা করেন। বয়স্ক লোকেরা ছোটদের এই চোখেই দেখেন। বিপ্লবী আন্দোলনও ছোটদের সেই চোখেই দেখে।

কমসোমল হচ্ছে বিপ্লবী দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠদের সংগঠন। এর সদস্যরা বড়দের সন্তান তুল্য, সবার স্নেহের পাত্র। বড়রা তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মী হিসাবে ভাবেন। এরাই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আগামী দিনে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা হবে, এই আশা নিয়েই দেখেন। কিশোর এবং সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণদের নিয়ে কমসোমল সংগঠন। এদের দেখার জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা থাকে। ডি এস ও, ডি ওয়াই ও-কে এভাবে নয়, অন্যভাবে দেখা হয়। ডি এস ও মেম্বাররা, ডি ওয়াই ও মেম্বাররা বা অন্যান্য সংগঠনের সদস্যরা কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করে। ছাত্রদের শিক্ষার দাবি, যুবকদের নানা দাবি — এসব নিয়ে লড়াই করে। এটা করতে করতে একদল বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী হবে, আর একদল মাঝে মাঝে কাজ করবে, আর একদল ঘর-সংসার ইত্যাদি করবে আবার সাধ্যমতো সমর্থনও করবে। তোমরা যারা এখানে এসেছ, তারা কিন্তু কোনও দাবি আদায় করার জন্য এখানে আসনি। তোমরাও নানা আন্দোলনে যাবে। কিন্তু মূলত কোনও দাবি আদায়ের জন্য কমসোমল সংগঠন নয়। এখানে ভবিষ্যতে উপযুক্ত বিপ্লবী হওয়ার জন্য প্রাথমিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। অন্য সংগঠনের সঙ্গে কমসোমলের পার্থক্য হচ্ছে এখানে। এখানে কেউ চাইলেই সদস্য হতে পারবে না। এখানে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। যারা অন্তত এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আছে যে, এই শিক্ষা নিয়েই আমি চলব, ভুল করতে পারি, ব্যর্থ হতে পারি, পিছিয়ে যেতে পারি কিন্তু এটাকেই সামনে রেখে আমি এগোব এবং দলের নেতৃত্বের গাইডেন্সে, নির্দেশে, পরিচালনায় আমি নিজেকে গড়ে তুলব। নেতারাই আমার অভিভাবক, যথার্থ অভিভাবক, এঁরাই আমাদের যথার্থ শিক্ষক, এঁরাই আমাদের কাছে যথার্থ মনুষ্যত্বের শিক্ষাকে নিয়ে আসছেন — এসবের মূল্য দেব। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যারা আসবে এবং চলবে, তারাই কমসোমলের সদস্য হবে। এখানে কয়েকটি জিনিসের উপর জোর দিতে হবে। নিয়মিত খেলাধূলা, ব্যায়াম করতে হবে, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনেক কিছু পড়তে হবে, জানতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে সত্যও থাকে, মিথ্যাও থাকে, অনেক ভুলভালও থাকে। কারণ, পাঠ্যপুস্তক সরকার তৈরি করে। যথার্থ মানুষ তৈরি করা, বিপ্লবী গড়ে তোলা তো তাদের লক্ষ্য নয়। যে পুঁজিবাদী অত্যাচারী সিস্টেমটা চলছে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য। এই সিস্টেমকে গোলামের মতো মেনে নেওয়ার মন তৈরি করা, এই শোষণ যন্ত্রে চাকার মতো ক্রিয়া করার দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা

দেওয়ার জন্য যেগুলো পড়ানোর দরকার, এখন সেগুলোই পড়ানো হয়। কিন্তু এর মধ্যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, সেটা পরীক্ষার দ্বারা বিচার করতে হয়। নিছক জানার জন্য পড়া এক জিনিস, আর সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য পড়া আরেকটা। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তা তোমাদের নেতৃত্বের কাছ থেকে বুঝতে হবে। এখান থেকে সে শিক্ষাটা নেবে।

এসব আলোচনা করলেই একদল বলে থাকেন, 'রাজনীতি হচ্ছে।' এটা ঠিক হচ্ছেনা। ছাত্রজীবনে কৈশোরে রাজনীতি করা উচিত নয়, এ নিয়ে মাতামাতি করলে ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। শিক্ষক-অভিভাবকরা যখন বলেন, তাঁরা সৎ মনে ভালবাসা থেকেই বলেন। কিন্তু একদল রাজনীতিবিদ ও তাদের সাকরেদরা যখন বলেন, তখন অসৎ উদ্দেশ্য থেকেই বলেন। এবার এ সম্পর্কে সেই যুগের কয়েকজন বড় মানুষের বক্তব্য উল্লেখ করব। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ম্যান মেকিং, লাইফ বিল্ডিং, ক্যারেক্টার বিল্ডিং', ক্যারিয়ার বিল্ডিং নয়। তখন তাঁর এই বক্তব্যের তাৎপর্য্য কি? অন্যায়-অত্যাচার-বঞ্চনার প্রতিবাদ ছাড়া শুধু বই পড়ে কি বিবেকানন্দ আকাঙ্খিত শিক্ষার্জন সম্ভব? তিনি আরও বলেছিলেন, "লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তের দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষালাভ করে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা ঐ দরিদ্রদের কথা একটিবার চিন্তা করার অবসর পায় না — তাদের বিশ্বাসঘাতক বলি।" বিবেকানন্দের এই অভিযোগকে শিক্ষার্থীদের কিভাবে দেখা উচিত? রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে', তখন ছাত্রদের এই উক্তির তাৎপর্য্য কি হবে? তারা চোখের সামনে অন্যায় দেখেও পরীক্ষার পড়ার তাগিদে চোখ বুজে থাকবে? আর শরৎচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেই দেশের কাজে যোগ দেবার — দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করার অধিকার আছে। বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না। তোমাদের মত কিশোর-বয়স্কদেরও না। একজামিনে পাশ করা দরকার, — এ তার চেয়েও বড় দরকার।" শরৎবাবুর এই উক্তির তাৎপর্য্য স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কি করতে বলে? আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র আরও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' — 'অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা' — এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগকে দেশসেবার কার্য্য হইতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন। অধ্যয়ন কোনওদিন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাশ। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে — হয়তো বড় চাকুরী পাইতে পারে — কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না।" এখন তোমাদের ঠিক করতে হবে, এই বড় মানুষদের কথার মূল্য দেব না কল্যাণকামী শিক্ষক-অভিভাবক বা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের কথার মূল্য দেব? একটা সোজা যুক্তি অনেকে দিয়ে থাকেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই কথাগুলির যে মূল্য ছিল আজ আর তা নেই। দেশের জনগণের স্বার্থে, তাদের উপর অন্যায়-অত্যাচার প্রতিকারের স্বার্থে কাজ করা বোঝায়। এইজন্যই ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।" ছাত্রজীবনে বিদ্যাসাগরের এই মহান উক্তি কি করতে বলে? আর আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আদর্শের জন্য শুরুতেই যাঁরা জীবন দিতে এগিয়ে আসেন, তাঁরা সবসময়ই মুষ্টিমেয়। তাঁরা প্রাণবন্ত ছাত্র-যুবক। .....আমি বলি, এটাই সবচেয়ে আনন্দের এবং মর্যাদার পথ। হ্যাঁ, সংগ্রামের এই পথ অত্যন্ত বেদনাময় হতে পারে, কখনও কখনও তা খুবই কষ্টসাধ্যও হতে পারে — তবুও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মর্যাদাময় জীবনযাপনের এটাই একমাত্র পথ। এই সংগ্রামে আপনাদের মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে — কিন্তু আপনারা মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করেই মৃত্যুকে বরণ করবেন।" আমরা জানি চাপেকার ভায়েরা, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ভগৎ সিং, আজাদ, আসফাকউল্লা, বিসমিল, বাঘাযতীন, প্রীতিলতারা — তাঁদের কৈশোর-যৌবনে এইভাবেই মাথা উঁচু করে মৃত্যুবরণ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তোমরা কি এঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে না?

তাছাড়া চাইলেও কি কেউ রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে? রাজনীতি কি করে? যেকোন দেশের অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সরকারী কাজকর্ম, আইন-কানুন ঠিক করা, থানা-পুলিশ কন্ট্রোল করা, জিনিষপত্রের দাম ঠিক করা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সবই তো রাজনীতি চালায়। আর এগুলি নিয়েই তো আমাদের সকলের জীবন। ফলে ঠিক পথেই হোক আর বেঠিক পথেই হোক রাজনীতিই আমাদের জীবনকে চালায়। ফলে আমরা কেউই রাজনীতির প্রভাবমুক্ত নই, থাকতে পারি না। সাধারণ মানুষ যারা মনে করেন, আমরা ছাপোষা মানুষ, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কি করব, ফলে রাজনীতি আমাদের পোষায় না, আমরা ঐ সব ঝুট-ঝামেলায় থাকতে চাই না। তারা জানেন না যে, অজানিতভাবেই তারা রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। দেশ যেভাবে চলছে, দেশকে যেভাবে চালানো হচ্ছে, তাকে বিধাতার বিধান বা অদৃষ্টের লেখা বলে নির্বিচারে মেনে নেওয়াও

রাজনীতি, আবার এর প্রতিবাদ করাও রাজনীতি। ইংরেজ আমলে যেমন ব্রিটিশদের কৃপাধন্য হবার জন্য, রায়-বাহাদুর-খান বাহাদুর খেতাব অর্জন করার জন্য, প্রচুর ধনদৌলতের মালিক হওয়ার জন্য এ দেশেরই একদল খয়ের খাঁ ছিল, যারা গোপনে খবর দিয়ে বিপ্লবীদের স্বদেশীদের ধরিয়ে দিত, লোকদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত যায় না। ফলে ওদের নাড়ানো যাবে না। বিপ্লবীদের সম্পর্কে ব্যাঙ্গ করে বলত, 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার'। এরা আবার ব্রিটিশদের তাড়াবে? অন্যদিকে এরই বিপরীতে ছিল স্বদেশী আন্দোলনের রাজনীতি, বিপ্লবী সংগ্রামের রাজনীতি। যে রাজনীতির মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, অর্থ-নাম-পদ প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই, আছে শুধু দেশের জন্য সবকিছু দিতে পারা, এমনকি জীবনও দিতে পারে। এই রাজনীতিই মানুষকে চরিত্র দেয়, মনুষ্যত্ব দেয়, দেয় চারিত্রিক দৃঢ়তা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী মানসিকতা। আজও দেশে দুই ধরনের রাজনীতি আছে। দেশকে চালাচ্ছে কারা? শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে, 'এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। তাও গুটিকয়েক ব্যবসাদারের হাতে। বণিকীবৃত্তিই মুখ্যত রাজনীতি, শোষণের জন্য শাসন।' ফলে আজ পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠন-শাসন চলছে। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে যেসব দল গদীসর্বস্ব রাজনীতি করছে মন্ত্রীত্বের গদী দখলের জন্য পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-মজুতদার-কালোবাজারীদের কৃপায় তারা এক ধরনের রাজনীতি করে। শিল্পপতি-ব্যবসাদাররা যেমন কারখানার ম্যানেজার রাখে, বিজনেস ম্যানেজার রাখে, এই দলগুলিও ওদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। মাঝে মাঝে মালিক যেমন ম্যানেজার পাল্টায়, তেমনি ভোটেও পুঁজিপতিদের প্রয়োজনে ম্যানেজার পাল্টায়। ফলে এই দলগুলির রাজনীতির মধ্যে কোন নীতি-আদর্শের বালাই নেই, শুধু ভোট আর গদী, আর পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-কালোবাজারীদের গোলামী করা। এরা চায় ছাত্র-যুবকরা এদেশের অতীতের বড়মানুষদের, বিপ্লবীদের ভুলে যাক। শুধু যেভাবেই হোক টাকা কামানোর ধান্ধায় ডুবে যাক, মদ-জুয়া-সাট্টা-ব্লু ফিল্মের, নোংরা যৌন সাহিত্য-নাটক-সিনেমার স্রোতে ভেসে যাক। যাদের নারীদের প্রতি আচরণ পশুদের থেকেও অধম, যারা বৃদ্ধ বাবা-মাকে পথে বসায়, এভাবেই যুবকদের অমানুষ বানাতে পারলে দেশে প্রতিবাদ-আন্দোলন হবে না। পুঁজিবাদ ও এই দলগুলি নিশ্চিন্ত থাকে। কারণ লোভী, স্বার্থপর, বিবেকহীন কখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না। এরই বিপরীতে চলছে পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত বিপ্লবী রাজনীতি। যে রাজনীতি ব্যক্তিগত স্বার্থ-লোভ-লালসা মুক্ত হতে শেখায়, সাহস-তেজ-মনুষ্যত্ব দেয়, কাপুরুষতামুক্ত হয়ে যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখায়। বৃদ্ধ ও

নারীদের সম্মান করতে শেখায়, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবন দিতে শেখায়। তোমাদের এই দুই রাজনীতির মধ্যে বেছে নিতে হবে। সাতে-পাঁচে থাকবে না, আমি নিউট্র্যাল — এই চিন্তা ভুল। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা এর মধ্যে নিউট্র্যাল বলে কিছু থাকতে পারে না।

আর দেশের কাজে যুক্ত হলে, বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত হলে কোন ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে? এদেশে মুষ্টিমেয় ধনীর দুলাল ছাড়া আর কারও কি কোন নিশ্চিত ভবিষ্যত আছে? যে দেশে কোটি কোটি মানুষ জমিচ্যুত-কর্মচ্যুত হয়ে শহরে শহরে ভবঘুরের মত ঘুরছে শুধু দুটি পয়সা রোজগারের জন্য, যে দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর ঘাড়ে বার বার ছাঁটাইয়ের খাঁড়া পড়ছে, কোটি কোটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত — এমনকি উচ্চশিক্ষিতরাও বেকারীত্বের দুঃসহ জ্বালায় ছটফট করছে, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে, অসহ জ্বালায় আত্মহত্যা করছে, সর্বস্বান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ মা-বোন নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছে, কত লক্ষ শিশু সন্তান ফুটপাতে জন্মাচ্ছে, ফুটপাতেই মরছে — সেই দেশে কার কি নিশ্চিত ভবিষ্যত থাকতে পারে? ফলে একজন স্কুল-কলেজের ছাত্রের সামনেও কোন আশা নেই, ভরসা নেই, স্বপ্ন নেই, শুধু আছে বিস্তৃত অন্ধকার আর ধূ ধূ মরুভূমি। আর আমাদের লড়তে হবে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের দ্বারা আগামী দিনে সকলের জন্য নিশ্চিত ভবিষ্যত গড়ার জন্য।

পুরানো দিনের কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে সত্যের জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সঙ্গী কেউ না থাকলেও প্রয়োজনে একাকী নির্ভয়ে এগোতে হবে, সব বড় মানুষেরা এভাবেই এগিয়েছেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'। আর সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'বন্ধুবিহীন অবস্থায় একাকী দাঁড়িয়ে সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত সাহস তোমাদের মনে জাগরুক হওয়া চাই। ..... যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারারুদ্ধ অথবা লাঞ্ছিত হয় — সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।' নিজেকে বড় ভাবতে নেই, অহংকারকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তাই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'নিজে যাকে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে, বড় সে হয়।' আজকের দিনে অখণ্ড স্বার্থপরতায় বলা হয়, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। আর সেই যুগে বলা হতো, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। যেকোন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মে যেকোন মূল্যে সকলের ঐক্য রক্ষা করতে হবে।' হীন ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা তাকে দুর্বল করা চলবে না, সেজন্যই বলা হয়েছিল, 'একতাই বল।' আর যেকোন মহৎ আন্দোলনে, সামাজিক কর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে

লড়লে হারতেও পারি প্রথমদিকে বারবার। তাতে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, পরাজয়ের লজ্জার গ্লানি বহন করলে চলবে না, তাই বলা হয়েছিল, 'সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'। যথার্থ মানুষ হওয়া কাকে বলে? শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদাবোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।' শরৎবাবুর ছাত্র-যুবকদের প্রতি আরেকটি মূল্যবান উপদেশও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। শুধুমাত্র সত্যকে মেনে নিলেই চলবে না। তিনি বলছেন 'শুধুমাত্র মানাই এর সবটুকু নয়, — বস্তুতঃ, আর এক দিক দিয়ে কোন সার্থকতাই এর নেই — যদি না চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে, জীবনযাত্রার পদে পদে এ সত্য বিকশিত হয়ে ওঠে। ভুল জানা, ভ্রান্ত ধারণা, বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু ভিতরের জানা ও বাইরের আচরণে যদি সামঞ্জস্য না থাকে — অর্থাৎ যদি জানি এক রকম, বলি আর এক রকম এবং করি আর এক রকম, তবে জীবনের এতবড় ব্যর্থতা, এতবড় ভীরুতা আর নেই।" শরৎচন্দ্রের কথা যখন তুললামই তখন তাঁর আরও কিছু মূল্যবান বক্তব্য তোমাদের স্মরণ করাব। তোমরা হয়ত অনেকেই জান না, বিদ্যাসাগর ও শরৎচন্দ্র ভগবানে বিশ্বাস করতেন না, ধর্মীয় শাস্ত্র মানতেন না, তাঁরা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন। বিদ্যাসাগর যেমন বলেছিলেন, সাংখ্য ও বেদান্তে সত্য পাওয়া যায় না, সত্য পেতে হলে বিজ্ঞান, বস্তুবাদী দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের চর্চা করতে হবে। তেমনি শরৎচন্দ্রও বলেছিলেন, 'সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার, বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নেই।' কেন বলেছিলেন, 'বিশ্ব মানবতার এতবড় শত্রু আর নেই? কারণ দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত মানুষকে শেখানো হয়, 'সবই বিধির বিধান, তুমি না খেয়ে মরছ, বিনা চিকিৎসায় মরছ, বেকারীত্বের জ্বালায় ভুগছ, এ সবই অদৃষ্টের লিখন, পূর্বজন্মের কর্মফল, পূর্বজন্মে যেমন পাপ করেছ, এ জন্মে তার ফল ভোগ করছ। ধনী-গরিব ভগবানের সৃষ্টি। পূর্বজন্মে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য ভগবান ধনীদের দুহাতে ধন-দৌলত-ঐশ্বর্য দিয়েছে। ফলে বিধির বিধান খণ্ডানো যায় না। ভগবানের উপর অচলা ভক্তি রেখে তার দেওয়া সব দুঃখ কষ্ট যদি হাসিমুখে মেনে নিতে পার, তাহলে পরজন্মে তিনি মুখ তুলে তাকাবেন। তুমি অনেক সুখ ভোগ করবে।' এই বিশ্বাসই যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত মানুষকে মাথা তুলতে দেয়নি, প্রতিবাদ করতে দেয় নি, কারণ তাতে আরও পাপ বাড়বে। এ ভাবেই ধর্ম শত্রুর মত কাজ করেছে। কিন্তু তোমাদের একথাও জানা দরকার ঈশ্বর চিন্তা গোড়ার দিকে মানব সমাজে ছিল না, তখন মানুষের চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতিভিত্তিক, বস্তুজগৎভিত্তিক। স্বয়ং বিবেকানন্দ একথা বলেছেন, ইতিহাসেও তাই পাওয়া যায়। এখনও আফ্রিকায়, আন্দামানে, নানাস্থানে আদিবাসীদের পাওয়া যায়, যারা

প্রকৃতিকে, নদী, আগুন, পাহাড়, মাটি, গাছপালাকে পূজা করে বশীভূত করার জন্য, বস্তু বহির্ভূত কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তির ধারণা তাদের মধ্যে নেই, প্রাচীন গুহাচিত্রের মধ্যেও এসব পাওয়া যায় না। ধর্মীয় চিন্তা এসেছে পরবর্তী সমাজ দাসপ্রথার যুগে, যখন সমাজে শাসক-শাসিত, দাসপ্রভু-দাস সম্পর্ক এসেছে। সেই যুগের একদল চিন্তাশীলের মনে ধাক্কা দিয়েছিল, দাসপ্রভুর বিধানই শেষ কথা, এর উপর কি আর কিছু নেই? তখন তাঁরা দেখলেন, সমাজ চলছে একটা নিয়মে — দাসপ্রভুর নির্দেশে। তেমনি নদীতে জোয়ার-ভাঁটা, ঋতু পরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যু, দিবারাত্রি এ সবই তো একটা নিয়মে চলছে — তাহলে এই নিয়মের স্রষ্টা কে? এখান থেকেই এল বিশ্বেরও একজন প্রভু আছে। তিনিই সৃষ্টি কর্তা, আর যেহেতু তিনিই সৃষ্টি কর্তা, সেই হেতু দাসপ্রভু ও দাস সকলেই তার সন্তান, ইন দি আই অফ গড অল আর ইক্যুয়াল। ভগবানের চোখে সকলেই সমান, দাসপ্রভু শাসন করবে, কিন্তু তাকে বিশ্বপ্রভুর বিধান অর্থাৎ গীতা, বাইবেল, কোরান এসব মেনে শাসন করতে হবে — এগুলি হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী, 'অবতারেরা' ঈশ্বরের এই সব বাণী নিয়ে এসেছে। অবতার কারা? সেই যুগে যাঁরা সবচেয়ে সৎ, মানবকল্যাণকামী ও সত্যসাধনাকারী। সেই যুগে মানুষ বিশ্বাস করত মানুষের মধ্যে আত্মা আছে, এই আত্মা পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মের অংশ। পরমব্রহ্মই পরম জ্ঞান। ফলে মনের চিন্তা পরমব্রহ্ম থেকেই আসে। অবতারেরা সেই চিন্তা নিয়ে আসেন। এরকমভাবে ভাবত বলেই তখনকার দিনে যেকেউ বিশেষ ক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী ছিল, তাতে ভাবা হত ঈশ্বরের দানেই এটা সম্ভব হয়েছে। যে কথা আজ কেউ বলবে না যে সেক্সপীয়ার, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, বা নিউটন, আইনস্টাইনরা দৈব আদেশের জোরে এসব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। এই ধরনের চিন্তা তখন মানুষ করতে বাধ্য হয়েছিল, যেহেতু বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেনি। বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতি ও জীবনের নানা রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হয় নি। ফলে একথা তোমাদের বুঝতে হবে, প্রথম যুগের ধর্মপ্রচারকরা সকলেই সৎ ছিলেন, মানব কল্যাণকামী ছিলেন, বড়মানুষ ছিলেন। আর সেহেতু তাঁরা বলেছিলেন যে দাসপ্রভুদের বিশ্ব প্রভুর বিধান মানতে হবে, তাই গোড়াতে যীশুখৃষ্ট তাদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন, হজরত মহম্মদ আক্রান্ত ও রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন। এছাড়া সব ধর্মই সমাজে নিয়ে এসেছিল সেই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যবোধ, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ। এই অর্থে ধর্ম কিন্তু তখনকার দিনে প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু আবার এই ধর্মীয় চিন্তার মধ্যেই আছে ধনী-গরিব ভগবানের সৃষ্টি, তার ইচ্ছাই কর্ম, তাই যা কিছু ঘটছে তার ইচ্ছাতেই ঘটছে, — ফলে এর বিরুদ্ধে যাওয়া পাপ। তিনি চিরন্তন, শাশ্বত, তার বাণী কোরান,

বাইবেল, গীতাও চিরন্তন, অলংঘনীয়। ফলে কালক্রমে ধর্ম শোষকদের অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল, যদিও তখন আর প্রথম যুগের ধর্মপ্রচারকরা কেউ আর বেঁচে নেই। এই অর্থেই শরৎচন্দ্র ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বিশ্ব মানবতার এতবড় শত্রু আর নেই।' তোমরা শরৎচন্দ্রকে যাতে না ভুল বোঝ তার জন্যই আমাকে এত কথা বলতে হলো। শাশ্বত সত্যের ধারণাকে খণ্ডন করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ, কাল বা পাত্রের যে সম্বন্ধ বা রিলেশন তা দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ কাল পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা।" তিনি আরও বলেছিলেন, "তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য; — এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়, — এরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে।" শরৎচন্দ্রের এত কথা উল্লেখ করলাম কেন? কারণ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী ইনিই। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী বিপ্লবী চিন্তানায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে তিনি অর্থাৎ শরৎচন্দ্র মানুষের অন্তরে যেভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেভাবে পারেন নি। রম্যাঁ রল্যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। একদিন বাংলার ঘরে ঘরেই নয়, ভারতের ঘরে ঘরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য চর্চা হতো, এমনকি বিভিন্ন রাজ্যের লোক দাবি করতো, শরৎচন্দ্র তাঁদের রাজ্যেরই। এই শরৎচন্দ্রের নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে ভারতের শোষকশ্রেণী, সরকারী রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা। শুধু একজন পুনরায় শরৎসাহিত্য চর্চার আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি নিজে বার বার শরৎসাহিত্য পড়তেন, আমাদেরও পড়তে বলতেন, তোমাদের আমি পড়তে বলবো। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ছাত্রদের কাছে তাঁর শেষ আবেদন উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি বলেছিলেন, 'সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে গেলে সে-ফাঁকি এক সময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই বলবো — অনন্ত ভবিষ্যত তোমাদের সামনে, তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও। চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়।"

তোমাদের এদেশের ও বিদেশের বড় মানুষদের জীবনী, বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম ভালো করে জানতে হবে। জানতে হবে এই মন নিয়ে যে, তাঁদের কার কাছ থেকে কী কী শিক্ষা নিয়ে আমিও বড় হতে পারি। তোমাদের ভালো করে পড়তে হবে এদেশের ও বিদেশের নবজাগরণ, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক বিপ্লব, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের আদর্শ, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও লড়াইকে ভিত্তি করে রচিত গল্প, উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থগুলিকে। এই শেখার মন নিয়েই ছোটবেলায় আমরা এসব কিছু কিছু পড়েছি, এখনও সুযোগ পেলে পড়ি। এগুলি মন ও চরিত্র গঠনে খুবই সাহায্য করে। হাতে যে কোনও বই পেলেই পড়ো না, এখানেও নির্বাচন থাকা দরকার। এমনকী নিছক বিনোদনের জন্য যে কোনও সিনেমা, নাটক, দেখা ও গান শোনা উচিত নয়। এরও মূল বিষয় (কনটেন্ট) ও পরিবেশনার রূপের (ফর্ম) মধ্যে একটা ফলাফল থাকে। হয় উচ্চমানের, না হয় নিম্নমানের, হয় উপরে তুলবে, না হলে নিচে নামাবে। এভরি অ্যাকসান হ্যাজ গট ইটস অপোজিট রিঅ্যাকসান। কোনও কিছুই প্রতিক্রিয়া হয় না, এরকম হয় না। ফলে পড়া, দেখা, শোনা — এগুলিরও একটা প্রভাব থাকে। যেমন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা খাই। কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কিছু খাওয়া উচিত নয়, আপাত লোভনীয় ও আকর্ষণীয় হলেও। ফলে কী ধরনের বই পড়বে, কী ধরনের নাটক, সিনেমা দেখবে, কী ধরনের গান শুনবে, এসব নির্বাচনের ক্ষেত্রে জ্ঞান, মন ও চরিত্র বিকাশের উপযোগী কিনা বিচার হওয়া দরকার, না হলে কিছু না কিছু ক্ষতি বর্তাবেই। ফলে এক্ষেত্রেও বড়দের গাইডেন্স নেবে। আর একটা হল মাতৃভাষার সাথে হিন্দি ভাষা, ইংরেজি ভাষা এবং অন্য কোনও সর্বভারতীয় ভাষা শেখা দরকার। অঙ্ক শিখতে হবে খুব ভালো করে। অঙ্কটা নিছক যোগ বিয়োগ শেখা নয়। বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে অঙ্ক শেখা দরকার। অঙ্কটা তোমরা পাঠ্যপুস্তক বা অন্য বই থেকে পরীক্ষার জন্য থাকুক না থাকুক, খুব ভালো করে জানবে। পৃথিবীর মানচিত্র ভালো করে জানতে হবে। আর ইতিহাস জানতে হবে। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাখ্যাটা দলের বড়দের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে। ইতিহাস মানে যুদ্ধ আর রাজা রাজড়ার কাহিনী নয়। প্রচলিত ইতিহাসে জনগণ নেই, গরিব মানুষ নেই। এই ইতিহাসে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষের প্রকৃত যুদ্ধের কাহিনী নেই। এই ইতিহাসে নেই আদিম সমাজ কেমন ছিল, তা পাল্টে কেন দাসপ্রথা এল, দাসপ্রথা কী ধরনের ছিল, কেন দাসপ্রথা পাল্টে রাজতন্ত্র এল। কেন রাজতন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদ এল, আবার এই পুঁজিবাদ কীভাবে পাল্টাবে, ভবিষ্যতে কেন সমাজতন্ত্র আসবে, কোন নিয়মে এগুলি পরপর আসছে — এসব বিষয় এই ইতিহাসে নেই। নেই, কারা

কোন যুগে কী প্রয়োজনে কীভাবে এই সমাজ ব্যবস্থাগুলি পাল্টাচ্ছে? শ্রেণীপাঠ্য এসব ইতিহাসে যতটুকু যা আছে, তার সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে হবে নেতৃত্বের কাছ থেকে। তারপর গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হচ্ছে জগতকে বোঝার জন্য, পরিবেশকে বোঝার জন্য, জীবনকে বোঝার জন্য। এই বিশ্ব প্রকৃতি কী, পৃথিবী কোত্থেকে কীভাবে এল? প্রাণ কী? মন কী? চিন্তা ভাবনা কী? এগুলির সঠিক উত্তর বিজ্ঞান থেকে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান দেখায়, এই দুনিয়ার সব কিছু পাল্টাচ্ছে। এই মাইক্রোফোনটা স্থির দেখছ, আমি বসে আছি স্থির, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যাবে কোনটাই স্থির নয়। ফলে চিরন্তন অবস্থান ও শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। একটা বিশেষ নিয়মে প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে। এক এক ক্ষেত্রে এক এক নিয়ম। বিজ্ঞান তা আবিষ্কার করছে। এই নিয়মের ঊর্ধ্বে কোনও কিছুই নেই। যে কোনও ঘটনার কারণ থাকবে। ঘটনা মানে কার্য। কার্যের কারণ থাকে। যাকে কার্য-কারণ সম্পর্ক বলা হয়। সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এটা দেখিয়ে দেয়। সবকিছুরই যে পরিবর্তন হচ্ছে বিজ্ঞান এটা দেখায়। ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বোটানি, জিওলজি, জুলজি — এই জগতের এক একটা বিশেষ ক্ষেত্রের পরিবর্তনের বিশেষ নিয়মকে বিশেষভাবে আবিষ্কার করার বিজ্ঞান। তোমাদের চিন্তাকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। যা বিজ্ঞানসম্মত নয়, তাকে বর্জন করার মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

আমরা যে পরিবেশটা পেয়েছি সেটা তোমরা পাচ্ছ না। আমাদের শৈশবে আমাদের মাস্টারমশাইরা স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। মাস্টারমশাইরা কেউ কেউ তাঁদের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, শরৎচন্দ্র-নজরুলকে দেখেছেন, কেউ কেউ সুভাষ বোসের মিটিং-এ গেছেন। ক্লাসে তাঁরা এগুলি গল্প করতেন, আমরা হাঁ করে শুনতাম। তাঁরা স্বদেশি আন্দোলনে জেলে কীভাবে থাকতেন সে কথা আমরা গভীর আকর্ষণ নিয়ে শুনতাম। ছোটবেলায় এগুলো আমাদের সাহায্য করেছে। তোমরা সেই মাস্টারমশাইদের পাচ্ছ না, পাবে না। ফলে আজকে সমাজের স্তরটা অনেক নেমে গেছে। কোনও ব্যক্তি এজন্য দায়ী নয়। আমাদের মাস্টারমশাইরা ছোটবেলায় ক্লাসে ঘন্টা দেখে পড়াতেন না। আমরা বরং উঠি উঠি করতাম। পড়ানোর জন্যই থাকতেন, বসে কাটাতেন না। স্কুল ছুটির পর বাড়ি বাড়ি চলে যেতেন — ছাত্ররা কী করছে দেখার জন্য। এরকম কিছু কিছু মাস্টারমশাই দেখেছিলাম। আমাদের শিক্ষকরা খুব উঁচুদরের মানুষ ছিলেন। অভিভাবকরাও শিক্ষকদের গুরু বলতেন। ছোটবেলায় এসব আমাদের খুব সাহায্য করেছে। তখনও তো হিন্দু মুসলিম, জাতপাত ছিল। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় কোনও মুসলিম টিচার বাড়িতে এলে অভিভাবকরা

বলতেন শিক্ষকের পায়ে জল দাও। এক্ষেত্রে কোনও ধর্ম নেই। এগুলো আমাদের খুব সাহায্য করেছিল। আমাদের জীবন প্রভাতে অভিভাবকেরা প্রাতঃস্মরণীয় হিসাবে দেওয়ালে টাঙানো বড় মানুষদের ছবিগুলি চিনিয়ে দিতেন। আমাদের ছোটবেলায় বাবা মায়ের ঝগড়া আমাদের সামনে হত না। আমরা একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হয়েছি। আমাদের জ্যাঠা-জ্যেঠিমা, কাকা-কাকিমা, বাবা-মা, অনেকগুলি ভাই-বোন একত্রে খাওয়া শোয়া, ওঠা বসা হত। কে কার বাবা, কে কার মা বাইরে থেকে সেভাবে বোঝার উপায় ছিল না। ছোটবেলার সেই পাড়া প্রতিবেশী, সেই সমাজ আর নেই। অতীতে এটা আমাদের খুব সাহায্য করেছে। ছোটবেলায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে আমার এক পিসেমশাই ছিলেন গান্ধীবাদী আন্দোলনের নেতা, আমার পিসতুতো এক দাদা সুভাষ বোসের আন্দোলনের লোক। আমার আর এক পিসতুতো দাদা তখনকার দিনের কমিউনিস্ট পার্টির লোক। আমি যখন ক্লাস থ্রি ফোর ফাইভে পড়ি, তখন তেমন কিছু না বুঝলেও আঁচে তাপে থেকে এসবের প্রভাব কাজ করেছে। সে যুগ তোমরা পাওনি। যুদ্ধের সময় স্ট্যালিন লড়ছেন হিটলারের বিরুদ্ধে, সুভাষ বোস দেশ স্বাধীন করার জন্য লড়ছেন — বড়দের মধ্যে এসব আলোচনার টুকরো টুকরো খবর আমাদের কানেও আসত। যদিও তাৎপর্য বোঝার বয়স তখনও আমাদের হয়নি। আরও পরে আমরা যখন ফাইভ সিক্সের ছাত্র তখন আড়াই মাইল হেঁটে খবরের কাগজ পড়তে যেতাম, চীনে তখন মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনী কতদূর এগোচ্ছে, এ খবর জানবার জন্য। এগুলো আমাদের খুব সাহায্য করেছে। সে সুযোগ তোমাদের নেই। তোমাদের সময়টা অনেক পাল্টে গেছে। তখন টিভি আসেনি, ফলে টিভির উৎপাত আমাদের জীবনে ছিল না। আমাদের অল্প বয়সে শরৎবাবুর বই পড়া নিষিদ্ধ ছিল। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে শরৎচন্দ্রের বই পড়তাম, বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়তাম। এগুলো খুব আকর্ষণ করত। আমি যখন ক্লাস সেভেনে, তখন আমি গোর্কির 'মা' পড়েছি। সব কি বুঝেছি? কিন্তু সেটা একটা আকর্ষণ ছিল। আমি সেজন্য তোমাদের বলছি, বড় মানুষদের জীবনী পড়বে। এগুলো খুব সাহায্য করবে, খুব উপকার করবে। এঁদের কথা, এঁদের সংগ্রামের কাহিনী বড় হওয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দেয়। আর শরৎচন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দের লেখাগুলো খুব পড়বে। এঁদের কাহিনীগুলি থেকে শিক্ষা নেবে। কমরেড নীহার মুখার্জী লিখেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ ছোটবেলায় শরৎ সাহিত্য পড়েছেন। শরৎচন্দ্র যে বড় বড় চরিত্রগুলি এঁকেছিলেন, তাদের গুণগুলি কী করে আয়ত্ত করা যায়, তার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। তিনি বড় মানুষদের, বড় বিপ্লবীদের জীবনীও পড়েছেন। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষকে পেয়েছি এসবের মধ্য

দিয়ে। এগুলি তোমরা পড়বে — এই হচ্ছে একটা দিক।

আর একটা দিক হচ্ছে, তোমাদের বয়সি যারা, আর তোমাদের চেয়ে যারা ছোট, তাদের ভালোবেসে সাহায্য করবে। পরোপকার বৃত্তি চাই। আমার কাছে কিছু টাকাপয়সা আছে, মানে কেউ দিয়েছেন। এতে ভালো জামাকাপড় কিনতে পারি, অন্য কিছু করতে পারি। আবার পাড়ার একটা গরিব ছেলেকে সাহায্য করতে পারি। গরিব বন্ধুটিকে কিছু বই কিনে দিলাম, পরীক্ষার ফি দিলাম। আমার হয়তো পাঁচটা প্যান্ট শার্ট, শাড়ি বা জামা কাপড় আছে। আর কারুর একটা আস্ত আছে, অন্যগুলো ছিঁড়ে গেছে। আরও বেশি দামি জামাকাপড় নেব, নাকি যার শুধু একটা আছে তাকে আরেকটা দেব? দিতে চাইছি না এটা আমার লোভ, আমার স্বার্থপরতা, আরও বেশি পেতে চাইছি। আর যখন দিতে চাইছি, তার অর্থ লোভকে দমন করছি, স্বার্থপরতাকে দমন করছি। এই দুটোর মধ্যে কোনটা করব? এর মধ্য দিয়েই কিন্তু আমার পরিবর্তন হচ্ছে। এরকম ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়েই হৃদয় বড় হয়। অর্থাৎ ন্যায়ের কাজ, ভালো কাজ, লোকের উপকার করা, নিজে কষ্ট করেও অপরকে সাহায্য করা, বড় হওয়ার জন্য এগুলো খুব দরকার। আমার মা, আমার বাবা বা আমার বাড়ির আর কেউ আমাকে ভালোবেসে এমন কিছু করছেন যেটা আমি মনে করছি, বড় মানুষদের শিক্ষানুযায়ী, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী ঠিক হচ্ছে না; আমার মা আমার জন্য অনেক কিছু করছেন, কিন্তু আমার মাসতুতো ভাইবোন, খুড়তুতো ভাইবোন বা আমার বয়সি কোনও প্রতিবেশী যাদের খুবই দরকার তখন তাদের জন্য কিছু করছেন না; একই বাড়িতে আছি, কিন্তু সেই বাড়ির কোনও গরিব আত্মীয়কে মা দেখছেন না, তার কথা ভাবছেন না, শুধু আমাকেই দেখছেন। আমি বুঝছি, আমার মায়ের ঐ কাজটা ভালো নয়, যদিও মা তো আমায় ভালোবেসেই করছেন, কিন্তু তাহলেও আমি এটা মানতে পারি না, আমার ভালো লাগে না। আমি সেটা মাকে জানাই। এই যে বলতে পারা, প্রতিবাদ করতে পারা, এটা দরকার। আমি নিশ্চয় মায়ের কাছে বক্তৃতা করতে শুরু করব না, বুঝিয়ে মাকে বলব, মা, এটা ঠিক নয়, তুমি ঠিক করছ না। আমার জন্য করছে বলেই কি আমি একটা অনুচিত কাজ মেনে নেব! আমাকে ভালবেসে করছে বলেই মায়ের অনুচিত কাজটা ভাল হয়ে যায় না, মাকে শ্রদ্ধা জানিয়েই সেকথা ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে। কারণ এটা মানা মানুষকে বড় হতে সাহায্য করে না। এভাবে আপনজনের সাথে, যাঁরা ভালোবাসে তাঁদের সাথে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে বলতে পারা, আপত্তি করতে পারা, যে কত বড় পারা, বড় হলে তার তাৎপর্য বুঝবে। অনেকে যুক্তি দিয়ে বুঝেও শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে মেনে নেয়। তোমরা মেনে নিলে বড় হতে পারবে না।

তোমরা যারা স্কুলের হায়ার ক্লাসে পড়ছ বা কলেজে যাচ্ছ, তাদের উদ্যোগে ফ্রি কোচিং ক্লাস করা, পাড়ার গরিব ছাত্রদের বইপত্র দিয়ে সাহায্য করা উচিত। কারও চিকিৎসা হচ্ছে না, টাকা পয়সা তুলে সাহায্য করা, ওষুধপত্র কিনে দেওয়া — এসব কাজগুলি করলে অপরের উপকার হয়, নিজের মনটাও খুব বড় হয়, ভালো হয়। ভালো কাজে একটা আনন্দ থাকে, ভালো কাজ করতে করতে ভালো কাজ করার শক্তিও বাড়তে থাকে, চরিত্রও বিকশিত হতে থাকে। আর যেগুলো খারাপ, অনুচিত, আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণীয় বা লোভনীয়, সেগুলো থেকে নিজেকে সংযত করতে হয়। বিবেকের শাসনে প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়। ফলে চোখে পড়লেও সেগুলি থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার, নিজের ভিতরে এই লড়াইটা করা দরকার। বড় হতে চাইলে, ভালো হতে চাইলে অবিরাম নিজেকে পাল্টাতে হবে।

বড়দের সম্মান করব কেন? সম্মান করব এই জন্য যে, যাঁরা আমার চেয়ে বয়সে বড়, তাঁরা সবাই আমার জন্মের আগে এই পৃথিবীতে, সমাজে, দুনিয়ায় আমার থেকে কিছু বেশি কাজ করেছেন, আমাদের জন্যই করেছেন। তাঁরা বেশি কাজ করেছেন, বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, বেশি শিখেছেন বলেই আমি ছোট হয়ে তাঁদের কাছ থেকে শিখছি, তাঁদের কাছ থেকে জানছি। এই জন্য তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, তার জন্যই তাঁদের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন। এটা নিছক লোক দেখানোর জন্য নয়। আবার ধরো, যেটা আমার মা আমাকে বললেন বা দিতে চাইলেন, আমার ভালোর জন্যই বললেন, অন্তত মা তাই মনে করছেন, কিন্তু আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনদের বঞ্চিত করে দিতে চাইছেন, সেটা কি আমি মানব? না, মানব না। বড়দের যেটা ভুল সেটা বর্জন করব, যেটা ঠিক তা থেকে শিখব। আবার বড়রা ভুল বললে তাঁদের সম্মান দিয়ে বলব, চোখের জলে আমার মাকে বাবাকে বোঝাব — এটা ঠিক হচ্ছে না। এক্ষেত্রে দ্বিধা আসে, ভয় আসে। বাবা মা কষ্ট পাবেন, হয়ত রাগ করবেন। কিন্তু এই ভয়কে জয় করতে হবে। এটা একটা সংগ্রাম। যেমন সুভাষ বোস আই সি এস চাকুরী প্রত্যাখ্যান করে দেশের কাজে নেমে বাবা-মাকে কাঁদিয়েছেন। অনেক বড় মানুষরাই কাঁদিয়েছেন। সত্য, আদর্শ, ন্যায়নীতি বাবা-মায়ের থেকেও বড়। বড় হতে গেলে এভাবে সংগ্রাম করেই বড় হতে হবে।

ভুল এবং অন্যায় আলাদা, ভুল আর অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ আমি না বুঝে একটা কাজ করছি, যে কাজে কিছু ভুল হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে, এটা ভুল। আর একটা হচ্ছে, আমি জানতাম এটা ঠিক নয়, করতে চাইনি, অনুচিত কাজ করব না করব না ভেবেছি — কিন্তু লোভ দুর্বলতা এসে আমাকে

টেনে নিয়ে গেল, আমি করে ফেললাম। এটা অনুচিত কাজ করলাম, অন্যায় করলাম। কিন্তু এ অন্যায়ের জন্য আমার বিবেক দংশন আছে। করব না জানতাম, করব না ভেবেওছিলাম, কিন্তু একটা মুহূর্তের দুর্বলতা, লোভ আমাকে ঠেলে নিয়ে গেছে, নিজেকে কনট্রোল করতে পারিনি। করার পরে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে। এটা অন্যায়, কিন্তু এটা লঘু অন্যায়। গুরুতর অন্যায় হচ্ছে, জানি এটা করা উচিত নয়, অন্যায় জেনেও করেছি, কিন্তু এজন্য আমার কোনও অনুশোচনা নেই, বিবেক দংশন নেই এবং ভবিষ্যতেও সুযোগ পেলে এই অন্যায় আমি আবার করব, যেহেতু ইতিমধ্যে আমার বিবেককে আমি মেরে দিয়েছি। গুরুতর অন্যায় হল, ডাহা মিথ্যা কথা বলে আমি নিজেকে গার্ড করার চেষ্টা করছি। সব জেনে বুঝে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচাচ্ছি। এটা মানুষকে নষ্ট করে দেয়। এসব থেকে সব সময় তোমরা নিজেকে মুক্ত রাখবে। বড় হতে হলে অনেক লোভ-লালসা, অনেক দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়, সংগ্রাম করতে হয়। আমরা যখন বলি সত্যের পথে চলা, তার মানে একটা আদর্শের পথে চলা, ন্যায়ের পথে চলা। বিবেকানন্দ বলছেন, 'সত্যের জন্য আমরা সবকিছু ছাড়তে পারি, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ছাড়তে পারি না'। মানব জাতির কল্যাণে যে যুগে যখন যে আদর্শ এসেছে, তখনকার যুগে সেটাই সত্য। এটা কমরেড শিবদাস ঘোষেরও শিক্ষা। যে সত্যের পথে চলতে চায়, জীবনকে সত্যভিত্তিক করতে চায়, সে সবসময় খুঁজবে, জানবে, কোনটা সত্য, সেটা বুঝে চলবে।

নেতৃস্থানীয় যাঁরা, অভিভাবক তুল্য যাঁরা, কমসোমলের নেতৃত্বে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের কাছে মন খুলে সবকিছু রাখতে হবে। কোনও কিছু গোপন রাখবে না। গোপনীয়তার দ্বারা কেউ বড় হতে পারবে না। কিছু বলব, কিছু বলব না, এটা করবে না। ভুল করতে পারি, মারাত্মক ভুলও করতে পারি, এমনকী জঘন্য অপরাধও করতে পারি, কিন্তু আমি চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্বীকার করি। এ লোকও পাল্টে যায়। পুরাণে দস্যু রত্নাকর তো বাল্মিকী হয়েছে। এটা বাস্তবেও ঘটে। যদি আমি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রাস্তা খুঁজে পাই এবং নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করি, তাহলে আমি পারব। এটা খেয়াল রাখবে। অনেক সময় দেখবে যে, কেউ অন্যায় করে বড়দের কাছে এসেছে, কাঁদতে কাঁদতে বলছে। এই যে সে বলতে পারছে, এটাই তার গুণ। ফলে নেতা কখনও তাকে তিরস্কার করতে, ভর্ৎসনা করতে পারেন না। সত্যিই সে অপরাধ করেছে অথচ নেতারা তাকে আর বকছেন না। কারণ নেতারা জানেন, ভুলটা যে করেছে সে অনুতপ্ত, বিবেক দংশনে ক্ষতবিক্ষত, সে এর থেকে মুক্ত হতে চায় বলেই তিরস্কৃত হবে জেনেও নেতৃত্বের কাছে বলেছে।

এই যে বলতে পারার ক্ষমতা, এটা তার গুণ। যখন কেউ কোনও বিষয় আড়াল করতে চায়, গোপন করতে চায়, তখন সে নিজের ক্ষতি করে। তার মধ্যে যে অন্যায়ের শক্তিটা আছে, ক্ষতিকর শক্তিটা আছে, গোপন করার দ্বারা সে সেই অপশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। তার ভেতরের সেই শক্তিটা বার বার তাকে অন্যায়ের দিকে নিয়ে যাবে, সেই শক্তিটা বাড়তে থাকবে, একদিন অনেক বড় ক্ষতি করে দেবে, ছোট ছোট উইপোকা যেমন একটু একটু করে সবটা খেয়ে নেয়, তারপর বিরাট বড় শক্ত স্তম্ভও ধসে পড়ে। ফলে আমি বলছি, নেতাদের সাহায্য নাও। ঘা হয়েছে শরীরে। সাদা পোশাক, ধোপদুরস্ত পোশাক দিয়ে গা ঢেকে ফেললেই কি ঘা সারবে? বরং আরও বাড়বে। আমার মনের মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে ঘা হয়েছে। পোকামাকড় হয়েছে। বাঁচতে চাই। বাঁচতে হলে আমাকে চিকিৎসা করাতে হবে। নেতারা হচ্ছেন চিকিৎসক। নেতাকেও উপযুক্ত নেতা হতে হবে, উপযুক্ত ডাক্তার হতে হবে। কেউ একটা মহা অন্যায় কাজ করেছে, নেতার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমি এই কাজ করেছি! যথার্থ নেতার মতো নেতা হলে বুকে জড়িয়ে ধরে তার সমস্ত কাদামাটি ধুয়েমুছে দেবে, তাকে বড় করবে। কমসোমল যাঁরা দেখবেন, তাঁদের এই গুণ থাকা দরকার। এ গুণ তাঁদের অর্জন করা দরকার। ও খুব বাজে, ও খারাপ, ও এরকম করেছে, ওর দ্বারা কিছু হবে না, এসব বলা চলবে না। খারাপ হয়ে কেউ জন্ম নেয় না। পরিবেশ থেকে কাদামাটি আসে, পোকামাকড় আসে। রামকৃষ্ণ বলতেন, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। মাও সে-তুং বলতেন, রোগ সারাও, রুগি বাঁচাও। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, সেই হচ্ছে নেতা যে মনে করবে সমস্ত কর্মীদের দোষ ত্রুটির দায়িত্ব আমার। তবে কর্মীকে ত্রুটি মুক্ত করতে পারবে। কখনও কোলে তুলে আদর করে বোঝাতে হয়, কখনও কঠোর শাসন করে বোঝাতে হয়, একেক ক্ষেত্রে একেকভাবে করতে হয়, কোনও ধরা বাঁধা ফর্ম নেই, চিকিৎসা শাস্ত্রের মতোই। নেতাদের এজন্য ব্যাপক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, দরদী মন, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য চাই। আমার সন্তানকে যখন আমি মারি, শাসন করি, সেটা তাকে সাহায্য করার জন্যই। সেই মারতে পারে, যে বাবা-মা মারার পর কোলে তুলে আদরও করতে পারে। মা যখন বলেন তোকে খেতে দেব না, সেটা তাঁর শাসন। খেতে না দিয়ে সেই মা নিজেও খেতে পারেন না। যে মা তোমায় খেতে না দিয়ে সিনেমা দেখতে চলে যায়, সে কি মা? শাসন করার অধিকার তারই আছে যে ভালোবাসতে পারে। ভালোবাসারই আর একটা রূপ কঠোর শাসন। আবার যেটা আদর করে বোঝানো দরকার, সেইভাবেই বোঝাবে। এই গুণাবলী অর্জন করা দরকার। নেতারা আবার তাঁদের ঊর্ধ্বতন নেতাদের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন জিনিসগুলিকে বুঝবার জন্য। নেতাদের

কাছে, বড়দের কাছে যেমন সবসময় সত্য কথা বলবে, তেমনি সব জায়গায় সব কথা বলতে নেই, এটাও মনে রাখবে। যেমন ধর রাস্তার মোড়ে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। অ্যাকসিডেন্টে দু'টি শিশু মারা গেল। বাবা মা মারা যাননি, গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। বাবা মা তোমাদের জিজ্ঞাসা করছেন, বাচ্চা দুটো বেঁচে আছে তো? তোমরা জান বাচ্চা দু'টি মারা গেছে। তখন কি বলবে মারা গেছে? বলবে না, বলবে বেঁচে আছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা মিথ্যা। তাহলে মিথ্যা বললাম কেন? বড় সত্যের জন্য, মহৎ কল্যাণের জন্য। আমি যদি আহত বাবা মাকে বলি তাঁদের সন্তান মারা গেছে, তাহলে সেই মুহূর্তে তাঁরা শোকে মারা যাবেন। বেঁচে যাওয়ার পর তাঁরা নিজেরাই সব জানতে পারবেন। ক্ষুদিরামকে অ্যারেস্ট করার পর তাঁকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার সাথে কে কে ছিল বল। ক্ষুদিরাম যা জানতেন, বললেন কি? বলেননি। বললেন, আর কেউ ছিল না। তাহলে কোথাও কোথাও আমরা সত্য গোপন করি। শত্রুর কাছে গোপন করি। আপাতদৃষ্টিতে এটা মিথ্যা। কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যে এটাই সত্য। এটা হচ্ছে কল্যাণের জন্য সত্য।

মনে রাখবে, আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, হামবড়া ভাব, মানুষের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। অহঙ্কার ক্ষতি করে কেন? অহঙ্কারীর হচ্ছে সবসময় সবজান্তা ভাব। অহঙ্কারী মন ভাবে, আমার আর কারুর কাছ থেকে কিছু জানার নেই, শেখার নেই, আমি সব জানি, সব বুঝি। বড়মানুষরা সকলেই বলেছেন, আমরা যদি কখনও মনে করি, আমরা অনেক জানি, তাহলেই আমাদের অগ্রগতির শেষ। কারণ জানার কোনও শেষ নেই। আমরা মনে করি অনেক জানি। দেখা গেল আমার জানাটা ঠিক নয়। অত্যন্ত কম জানি, কিন্তু মনে করি অনেক জানি। তখন অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী হয়ে যায়। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী কথাটা তো এজন্যই এসেছে! যথার্থ বিদ্যার অধিকারী, অনেক জ্ঞানের অধিকারী কখনও ভয়ঙ্করী হয় না। কথায় আছে শূন্য কলসিতে শব্দ হয় বেশি, ভরা কলসিতে তেমন শব্দ হয় না। মানে অনেক জানার অহঙ্কার তাতে থাকে না। যদি আমি বুঝি, আমি কম জানি অথচ জানার শেষ নেই, তাহলে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। অন্যের কাছ থেকে আমায় জানতে হবে, সকলের কাছ থেকে আমায় জানতে হবে — এতে জ্ঞান পিপাসা বাড়তে থাকে। যথার্থ জ্ঞানথেকে আসে বিনয়। সত্যিকারের জ্ঞানী লোক সব থেকে বিনয়ী, সবচেয়ে বড় মানুষ সবচেয়ে বেশি বিনয়ী। তাঁরা সকলেই আত্মমর্যাদার অধিকারী, কিন্তু আত্মম্ভরী নন। আত্মম্ভরিতাকে, অহঙ্কারকে, বড়াই করাকে তাঁরা ঘৃণা করেন। মহান লেনিন বলেছেন, তুমি যদি মনে কর, তুমি অনেক জান, তোমার আর বিশেষ জানার দরকার নেই, তাহলে আর যাই হোক তুমি কমিউনিস্ট হতে পারবে না। কখনও

আমি ভাবব না যে, আমি ওর চেয়ে বেশি জানি। এই তুলনা করাটাই ক্ষতিকারক। এই প্রতিযোগিতাটাই ক্ষতিকারক। প্রতিযোগিতা হবে ভালো এবং আরও ভালোর মধ্যে। আমি যা জানি, যতটুকু জানি, সেটা যদি সঠিক জানা হয়, ভালো জানা হয়, তবে ভালোই তো। আমি যা জেনেছি অন্যদেরও তা জানাব। এর চেয়ে আরও বেশি জ্ঞান কী, এর চেয়ে উন্নত আর কী আছে, তা জানার চেষ্টা করব। এই হচ্ছে যথার্থ প্রতিযোগিতা। ও জানে না, কিন্তু আমি জানি, তাই আমি মহা খুশি, কিংবা ও জানে ফলে ওকে ডাউন করার জন্য আমাকে উঠেপড়ে লাগতে হবে, আমাকে এজন্যই অনেক বেশি জানতে হবে — এটা নোংরা জিনিস। ব্যবসায়ীতে ব্যবসায়ীতে যেমন প্রতিযোগিতা হয়। ও দশ টাকা লাভ করে, ফলে আমাকে বিশ টাকা লাভ করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে সকলে জানবে, আমিও জানব। সকলেই বেশি করে জানুক আমি চাই, আমিও বেশি করে জানব। যে যত জানছে তার থেকে আমি তত শিখব। যে কম জানে, পিছিয়ে আছে, তাকে আমি টেনে তুলব, আমার জানার দ্বারা। এটাই আমার আনন্দ। এই মন নিয়েই চলা উচিত। ঈর্ষা অত্যন্ত ক্ষতি করে। অন্যকে ছোট করার, হারিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা অত্যন্ত ক্ষতি করে দেয়। প্রতিহিংসা খুবই ক্ষতি করে দেয়। কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার যদি করেও, পাল্টা খারাপ আচরণ করার দ্বারা তুমি তোমাকেই ছোট করবে। বরং তাকে ভালোবেসে খারাপ থেকে মুক্ত কর।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, কারুর ত্রুটি খুঁজবে না। বলতেন, আমি কারও ত্রুটি খুঁজতাম না। আমি সকলের কাছ থেকে, এমনকী যিনি ফুটপাত ঝাঁট দিচ্ছেন, তাঁর কাছ থেকেও শিখতাম, কী করে ঝাঁট দেন, তার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা কাজ করে, একটা দায়িত্ব কর্তব্যবোধ কাজ করে। রান্না করেন যিনি তাঁরও একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। বলেছেন, আমি এগুলির সবকিছু থেকে শিখছি। বলতেন জীবন্ত মানুষের মধ্যেই জীবন্ত গুণ আছে। আমরা সকলের কাছ থেকে শিখব। সেজন্য সকলের গুণই দেখ, ত্রুটি খুঁজবে না। আর তোমরা মনে রাখবে, সবকিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকা দরকার। শৃঙ্খলা কেন চাই? গোটা বিশ্ব চলছে শৃঙ্খলায়, সর্বত্র একটা নিয়মের রাজত্ব চলছে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত হচ্ছে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে, জোয়ার ভাটা হচ্ছে, ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। প্রাণ জন্ম নিচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে, সবকিছুর মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা আছে। একজন চাষি চাষ করছে, লাঙল ঠেলছে, তারপর মাটি ভাঙছে, ক্ষেতে জল দিচ্ছে, সার দিচ্ছে, বীজ পুঁতছে, আবার চারা উঠছে, তাকে রক্ষা করছে, তারপর ধান আসছে, ফসল তুলছে। এই যে একটার পর একটা দেখছ, কোনটাই যেমন তেমন করে হচ্ছে না। সবটাতেই শৃঙ্খলা আছে।

আমাদের শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য একটা শৃঙ্খলায় চলছে। একটা ছোট্ট অ্যাটম, বিজ্ঞান বলে, তার মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। আরও ছোট একটা ইলেকট্রনের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। সর্বত্রই নিয়মের রাজত্ব চলছে। যে কোনও কাজের মধ্যেই শৃঙ্খলা থাকবে, নিয়ম থাকবে। যে কাজের জন্য যে নিয়ম, একটা বিশেষ লক্ষ্য পূরণের জন্য যে বিশেষ নিয়ম, সেটা থাকবে। আমাদের মায়েরা যে রান্না করেন তারও কতগুলি নিয়ম আছে। আমাদের চিন্তার মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। তুমি যে অঙ্ক কষছ, তাতেও শৃঙ্খলা আছে। দুনিয়ার সবকিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকে, নিয়মটাই হচ্ছে শৃঙ্খলা। এজন্যই আমরা সকলে শৃঙ্খলা মানি। আমাদের শরীরটাও একটা শৃঙ্খলায় চলে। আমরা প্রশ্বাস নিই নিশ্বাস ফেলি। আমরা খাবার খাই, জল খাই — আবার মলমূত্র ত্যাগ করি। সবকিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে। তেমনি বিপ্লবী সংগঠনেও একটা শৃঙ্খলা আছে। বিপ্লবী হওয়ার আগে যে নিয়মে গড়ে উঠেছ, অভ্যস্ত হয়ে গেছ, সে নিয়মে এখন হবে না। বিপ্লবী সংগঠনের নিয়ম জানতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে, পুরনো অভ্যাস পাল্টাতে হবে। এইসব জিনিসগুলো তোমাদের বুঝতে হবে।

তোমরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ, বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ। তাই মনে হয় কিছু জরুরি কথা বলে যাওয়া দরকার, যাতে তোমরা অনেক দূর এগোতে পার, প্রত্যেকে অনেক বড় হতে পার। দেশের মানুষের যে এত ব্যথা-যন্ত্রণা, চোখের জল — তা মোছানোর কাজে যোগ্য হতে পার। আমাদের ছোটবেলায় ক্ষুদিরাম, সুভাষ বোস, শরৎচন্দ্র, নজরুলরা আমাদের মনুষ্যত্ব দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় বলতে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধুদের পেয়েছি। কিছুদিন পরে চলার পথে এ যুগের বড় মানুষ কমরেড শিবদাস ঘোষকে পেয়েছি। নাহলে হয়তো অন্যপথে চলে যেতাম। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছি। কিছু যেমন ঠিক করেছি, আবার অনেক ভুলও করেছি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী ভুল থেকে শিখেছিও। কৈশোরে যৌবনে যেসব কাজ করেছি সেইসময় ঠিক করেছি মনে হলেও, আজকে পরিণত বয়সে তার মধ্যেও অনেক ভুলভ্রান্তি দেখতে পাচ্ছি, তার থেকে শিখছিও।

আরেকটা কথা মনে রাখবে। আমাদের জীবনেও কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে যেগুলো আসে — নারী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, একটা চাহিদা, যেটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম — সেটা এসেছিল। দৈহিক আকর্ষণ যাকে আমরা বলি, এটাও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। পশুর জগতেও আছে, মানব সমাজেও আছে। কিন্তু দুটো এক নয়। এরও সূচনা আছে,

পরিণতি আছে। এরও স্বাভাবিকতা আছে, অস্বাভাবিকতা আছে, এর মধ্যেও সুন্দর আছে, অসুন্দর আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে ছোটবেলায় আমরা যেভাবে মানুষ হয়েছি সেখানে পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ, যাকে আমি বলছি দৈহিক আকর্ষণ বা নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ — পুরনো সমাজ থেকে আমরা জানতাম, এটা খারাপ চিন্তা, কুচিন্তা, এটা পাশবিক বৃত্তি। এই নিয়ে কথা বলা যাবে না, এ নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। বড়দের কাছে অন্য সব বলতে পারি, এই কথাটা বললে বড়রা রেগে যাবে। অথচ প্রশ্নটা আসা স্বাভাবিক। বারবার জানবার চাহিদা উপস্থিত হয়। কিন্তু চাহিদার উত্তরটা আমাদের আসে বিপথে, ভুলভাবে। খেলার মাঠে, স্কুলে, কমনরুমে বন্ধুবান্ধবের ফিসফিসানি, গোপন বই, গোপন বইয়ের নানান ছবি, সিনেমার নানান কাহিনী, এগুলির মধ্য দিয়ে আমরা এই দৈহিক আকর্ষণকে যেভাবে বুঝতে শিখি, তার মধ্যে অনেক জিনিস থাকে যেগুলো অসত্য, ভ্রান্ত, অসুন্দর, অবৈজ্ঞানিক, কুৎসিত। এজন্য তোমরা দায়ী নও। কারণ, এসব নিয়ে যথার্থ শিক্ষা আমাদের সমাজে নেই। তাই বলে কুশিক্ষা আমরা নেব না। এক্ষেত্রেও সত্যিকারের শিক্ষাটা দরকার, গাইডেন্স দরকার। সেই শিক্ষাটা যে কেউ দিতে পারে না। তাই যে কারুর কাছে, এর তার কাছে, এ নিয়ে আলোচনা করো না। এখানে আমি বলব, এই বয়সে যে প্রশ্ন যার মধ্যে যখনই আসুক — জীবন সম্পর্কে, যৌবন সম্পর্কে, দৈহিক আকর্ষণ সম্পর্কে — তারা তখনই দলের উপযুক্ত ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে নির্ভয়ে যাবে। তাঁদের থেকে গাইডলাইন নেবে। এর মধ্যে অন্যায়, পাপ, অপরাধ কিছু নেই। আড়াল রাখলে, গোপন থাকলে বরঞ্চ ক্ষতি। এটা তোমাদের কাছে আমার আর একটা সাবধানবাণী। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে আমি যা বুঝেছি, আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি যা বুঝেছি, তা তোমাদের কাছে রাখলাম। এর সঙ্গে আমি তোমাদের বলব যে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রশ্নের গুরুত্ব দেবে। কৈশোরে যে প্রশ্ন এসে গেছে — বই পড়ে, সিনেমা দেখে বা কোনও ঘটনা শুনে-দেখে, যেটা সে সময় না শুনলে, না দেখলেই ভালো ছিল, কিন্তু শুনে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি — সেটা মনে চাপা থাকলে, মনকে অস্থির করে। দেহকে নিয়ে, দৈহিক তাড়নাকে নিয়ে, নরনারীর আকর্ষণকে নিয়ে কিছু বাজে অভ্যাস আমরা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শিখে যাই, গোপন করতে থাকি, এগুলো অনেক ক্ষতি করে দিয়ে যায়, অস্থির অশান্ত করে তোলে। সমস্যা এলে জানাতে হবে দলের বড়দের কাছে। গোপন করবে না। নতুনকে দেখব বলে, সবকিছু দেখব বলে, নর্দমার নোংরা তো দেখা উচিত নয়। নোংরা কী আছে, ডাস্টবিনে কী আছে দেখতে যাবে? যাবে না, কারণ তা অস্বাস্থ্যকর। ফলে

নোংরা আলোচনা কেন শুনতে যাবে, নোংরা সিনেমা কেন দেখতে যাবে? আবার নরনারীর এই সম্পর্ক নিয়েই তো শরৎচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য। বারবার তৃপ্তির সাথে পড়ি। তার কত সৌন্দর্য, মাধুর্য, কত না সুন্দর প্রকাশ। আর এখনকার বহু নোংরা সাহিত্যে, সিনেমায়, নাটকে, ছবিতে, গানে, নরনারীর সম্পর্ক এমন নগ্নভাবে প্রকাশ করছে, যেখানে পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য থাকছে না। পশুদের জগতে কি চিন্তাভাবনা, রুচি-সংস্কৃতি, স্নেহ-মমতা আছে? আর এগুলিই তো মানব সভ্যতার সম্পদ। এইগুলি নিয়েই তো মানুষের জীবন এত সুন্দর, মধুর, যদি ঠিকভাবে তাকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারা যায়। আর যৌবনের এই সম্পর্ক নিয়েই তো বড়দের বিবাহিত জীবন। মানে পরিণত বয়সের পরিণত পরিণতি। তার মধ্যে সুন্দর-অসুন্দর থাকে। আমাদের বড়দের মধ্যে কারও দাম্পত্য জীবন আনন্দে সুন্দরে সার্থক হয়েছে। আবার কোথাও এসেছে চোখের জলের জীবন, অশান্তির কালো অন্ধকার। কারোর জামাইবাবু-দিদির জীবন সুখের হয়নি। দিদি চলে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। স্বামী থাকে হোটেলে। ঘটনাগুলো তো শুনতে পাই, দেখতে পাই। আবার কারো জীবন সুখের, আনন্দের। ফলে নরনারীর জীবন কোথাও সুন্দর, কোথাও অসুন্দর, কোথাও আনন্দের, কোথাও দুঃখের। এর মধ্যেও ন্যায়-অন্যায় আছে। এর মধ্যেও বিবেক-প্রবৃত্তি আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রেও শুধু দেহের দাবি দেখলেই চলবে না, তার চেয়েও বড় দাবি, রুচিসম্মত মনের দাবি তার চাহিদাকেও পূরণ করতে হবে। আবার মনও ভদ্র, পরিচ্ছন্ন, যথার্থ রুচিসম্মত হওয়া চাই। কোন সময়ে আমি জীবনে তা গ্রহণ করব, কোন সময়ে করব না, কোন সময়ে আমি দেহের দাবিকে স্বীকার করব, কোন সময়ে করব না, সেটা নির্ধারিত হবে পরিণত যৌবনে, আমার সুচিন্তিত রুচিসম্মত সিদ্ধান্ত এবং প্রবৃত্তির ওপর আমার বিবেকের নিয়ন্ত্রণকে নির্ভর করে, ইম্পাল্‌সের তাড়নায় নয়। আমার জ্ঞান বুদ্ধি, উন্নত রুচি, পরিণত বয়সে আমার জাগ্রত বিবেক দ্বারা আমার ভালোলাগা ও আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই যথার্থ মানুষটিকে বোঝবার, বিচার করার ক্ষমতা আমি অর্জন করি। নিছক বাহ্যিক আকর্ষণের ঊর্ধ্বে উঠে সেই বিচার করবার যে যোগ্যতা, তা আমি অর্জন করেছি কি? তোমাদের এখন কিশোর বয়স, জীবনের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে একাগ্র চিত্তে একলব্যের মতো জ্ঞানের সাধনার, সত্যের সাধনার ও চরিত্র গঠনের সময় — এই সময়ে পরিণত যৌবনের পরিণত চাহিদা নিয়ে মাতামাতি করলে মূল সাধনাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমাদের বিপথগামী করার ষড়যন্ত্র চলছে চতুর্দিকে। ষড়যন্ত্র চলছে যাতে তোমাদের সাধনা ভঙ্গ হয়, তোমরা বিপথগামী হও। আজকের পচাগলা

পুঁজিবাদী সমাজে তোমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করার আয়োজনই চতুর্দিকে। মনে রাখবে অবহেলায়, উন্মাদনায় জীবনের এই মূল্যবান সময় নষ্ট করলে পরবর্তীকালে জীবন ব্যর্থ হবে, দীর্ঘশ্বাস পড়বে, কিন্তু এই মূল্যবান দিনগুলি আর খুঁজে পাবে না। ফলে আমি কি উন্মাদ হব, উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসাব, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হব, পাগলের মতো ছুটব, দেহের দাবিতে জীবনকে নষ্ট করব? নাকি পরিণত বয়সে পরিণত রুচিসম্মত চিন্তাকে ভিত্তি করে একটা সুন্দর সুখী জীবন সৃষ্টি করব। এই যোগ্যতা ক্ষমতা শুধু দেহের শক্তিতে হয় না। এর জন্য মনের শক্তি দরকার, জ্ঞানের শক্তি দরকার, চরিত্রের শক্তি দরকার। তাই কৌতুহল যেমন চাই জ্ঞান অর্জনের জন্য, আবার সময়ের কৌতুহল, অসময়ের কৌতুহলেও পার্থক্য আছে। কোন সময় কোনটা জানব, কোন সময় কোনটা জানব না, এই সংযম থাকা চাই। আমি এখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র, আমি কি ইউনিভার্সিটির সাবজেক্ট নিয়ে বসতে পারি? তাহলে ক্লাস ফাইভের শিক্ষাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই পরিণত যৌবনে যে দায়িত্ব নেব, যে জীবনকে নেব, অপরিণত বয়সে সেই চিন্তা, সেই দায়িত্বকে মাথা পেতে নেওয়া সর্বনাশের সামিল। এসব প্রশ্নে যোগ্যতা অর্জনের জন্যই উপযুক্ত নেতাদের গাইডেন্স নেবে। নাহলে অনেক সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার আগেই অসময়ে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন একটা কুঁড়ি একটা সুন্দর প্রস্ফুটিত ফুল হতে পারত, বিকশিত হতে পারত, সৌরভে সৌন্দর্যে মাধুর্যে ভরিয়ে দিতে পারত, তাকে ঝড় এসে ফেলে দিল, পোকামাকড় এসে খেয়ে ফেলল, নষ্ট করে দিল। তেমনি কৈশোরে, অসময়েও পোকামাকড়, ঝড় এসে ক্ষতি করে দেয়। যদি তার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি, সঠিক চিন্তা মনে স্থান দিয়ে এগোতে পারি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তবেই বড় হব। সকল বড় মানুষ এভাবেই বড় হয়েছেন। আবার যদি পরিবেশের প্রভাবে এসব এসেও যায়, বড় হতে হলে নিঃসঙ্কোচে নেতাদের সাহায্য নেবে।

আজ এখানেই শেষ করছি। ভবিষ্যতে তোমাদের সাথে আমি আবার আলোচনা করব। তোমরা এত আলোচনা শুনতে নিশ্চয় অভ্যস্ত নও। পরে এরকম একটা ক্যাম্পে আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমার আলোচনার মধ্যে যে বিষয়গুলো তোমাদের কঠিন লাগছে, দুর্বোধ্য লাগছে, আরও কিছু ব্যাখ্যার দরকার বলে মনে করছ — এখানে যাঁরা তোমাদের বড়রা আছেন, তাঁদের কাছ থেকে সেগুলি তোমরা জেনে নিও।

সর্বশেষে তোমাদের আবারও বলতে চাই, তোমাদের বড় হতে হবে, যথার্থ বড় হতে হবে, অনেক বড় হতে হবে। তার জন্য আজকের দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের মহান পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও জীবন

সংগ্রামকে ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে। সেই শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আমাদের কাছে সমস্ত যুগের সকল বড় মানুষদের, মহান বিপ্লবীদের সংগ্রামের জীবন্ত প্রতিনিধি, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ। আমরা সকলেই তাঁর উপযুক্ত ছাত্র হওয়ার সংগ্রামে ব্রতী আছি। তোমাদেরও এই সংগ্রামে সামিল হতে হবে।

——

কিশোরদের প্রতি